Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সুমাইয়া

রোলঃ 227022493

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সুমাইয়া

রোলঃ 227022493

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে সুমাইয়া, আইডিঃ 227022493 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " উম্মে সুমাইয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে সুমাইয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

উম্মে সুমাইয়া

আইডিঃ 227022493

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ফিলিস্তিন মুসলমানদের প্রাণের ভূখণ্ড,আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস এর অবস্থানস্থল এবং অসংখ্য নবী-রাসূলের নবুওয়াত ও রিসালাত এর স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি।আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই ভূমিকে 'বরকতময় ভূমি' বলে উল্লেখ করেছেন।মসজিদুল আকসা ফিলিস্তিনের মাটিতে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকলেও ঈসরায়েলিদের মুহুর্মুহু গুলি ও বোমা বর্ষণে নারী-শিশুদের রক্তে রঞ্জিত তার প্রাঙ্গণ। আল-কুদস স্বাধীন হয়েও বর্তমানে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

দখলদার ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলকৃত যেকোনো মুসলিম ভূখণ্ড উদ্ধার করা সমগ্র মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে ইসলামের প্রথম কিবলার দেশ ফিলিস্তিনের বিষয়টি অন্যসবগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে ফিলিস্তিনের বাড়তি বৈশিষ্ট্যই তার মাঝে এনে দিয়েছে ভিন্নতা,নিজস্বতা।

গোধূলির লালিমার মতো ইতিহাসে ফিলিস্তিন রক্তের আধার। রক্ত বর্ণে লেখা এর সময়ালেখ্য, ইতিহাস।সাড়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে এর অধিবাসীরা বরাবরই ক্ষত-বিক্ষত।ফিলিস্তিন হাতবদল হয়েছে অসংখ্যবার।প্রতিটি হাতবদলে সাবেক অধিবাসীদের বিদায় ও নয়া বাসিন্দাদের স্বাগত জানিয়েছে সে রক্তের উপাখ্যানে। এখানকার মাটি-আকাশ বড় বড় সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী।সভ্যতার প্রতিটি উত্থানে-পতনে,সময়ের প্রতিটি পালাবদলের অপরপিঠে খোদিত যেন একখণ্ড রক্তাক্ত ফিলিস্তিন।

"

এখানে,এই পাহাড়ের ঢালে,সন্ধ্যা আর সময়ের কামানের
সামনে
ভাঙাচোরা ছায়ার বাগান পাশে রেখে,
আমরা তা-ই করি যা বন্দিদের করণীয়,
যা করে বেকারেরা;
আশার আবাদ করি।
একটা দেশ প্রস্তুত প্রত্যুষের জন্য।আমরা এগোচ্ছি
সহজ সরলতায়
নিকট থেকে দেখতে পাচ্ছি বিজয়ের ক্ষণ;
বোমাবর্ষণের আলোয় জ্বলে না আমাদের কোনো রাত্রি,
শত্রুরা সতর্ক;আমাদের জন্য আলো জ্বালে
কারাপ্রকোষ্ঠের অন্ধকারে।

এখানে কোথাও ‘আমি’ নাই।
এখানে আদম স্মরণ করছে তার কাদার কণিকা।

মৃত্যুর কিনার থেকে আদম বলেন ;
হারানোর মতো আর কোনো অবশেষ নেই আমার;
আমি মুক্ত;অবকাশের প্রায় কাছাকাছি।
হাতের মুষ্টিতে সমাহিত আমার ভবিষ্যৎ।
শীঘ্রই দেখবো আমি আমার জীবন,
জন্ম নেবো মুক্ত,আর পিতামাতাহীন,
এবং যেমন আমার নাম,আমি বেছে নেবো মহানীল অক্ষর।

-মাহমুদ দারবিশ

ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীনকালে কেনান নামে পরিচিত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের আয়তন আড়াই হাজার বর্গমাইল।ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের বর্তমান মিসর,জর্দান,সিরিয়া ও লেবাননের পাশে অবস্থিত ফিলিস্তিন একটি উর্বর ও ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়ার দেশ।ফিলিস্তিন আলাদা কোনো দেশ নয়,হাদিসের বর্ণনানুযায়ী এটি ‘বিলাদুশ শাম’ এর একটি অংশ।সাইয়্যেদুনা মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের মতো নবীগণের আবির্ভাব এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর সফর ও বসবাসের স্থান ছিল আজকের ফিলিস্তিন।ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে দেশটির কৌশলগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত।ফিলিস্তিনের পূর্বে রয়েছে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান ও সৌদি আরব।পশ্চিমে আছে আফ্রিকার আরব দেশ মিসর।এই পুরো অঞ্চল তেলসমৃদ্ধ।ফিলিস্তিনের উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর,যার তীরে সাইপ্রাস, তুরস্ক, গ্রিসসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো অবস্থিত।ইউরোপ থেকে সড়কপথে আফ্রিকা যেতে হলে ফিলিস্তিনই একমাত্র রাস্তা।ফিলিস্তিন এশিয়া ও আফ্রিকার দরজা।

ফিলিস্তিন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে অবস্থিত।এটাই ফিলিস্তিনের একমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা নয়।এর আরও সুবিধা আছে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশ ‘গালফ অব আকাবা ’ বা আকাবা উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত।আকাবা উপসাগরের এক পাশে সৌদি আরব।অন্য

পাশে মিসরের সিনাই উপত্যকা যা সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তৃত।আকাবা উপসাগরের সামনে রয়েছে লোহিত সাগর।মিসর ও ফিলিস্তিন ছাড়া অন্য কোনো দেশ একসঙ্গে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর তীরবর্তী নয়। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যক জাহাজগুলো প্রথমে লোহিত সাগরে আসে তারপর সুয়েজ খাল পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে যায়। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যের মেরুদণ্ড সুয়েজ খাল ফিলিস্তিন থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে।সে হিসেবে সুয়েজ খালে নজর রাখা কিংবা সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সাইপ্রাসের চেয়েও উত্তম জায়গা হচ্ছে ফিলিস্তিন।

ফিলিস্তিনের দক্ষিণে রয়েছে নজব এলাকা। যা ফিলিস্তিনের আয়তনের প্রায় অর্ধেক এখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। ফিলিস্তিনের মধ্যস্থানে অবস্থিত পশ্চিম তীর।একে পশ্চিম তীর বলা হয় কারণ এটা জর্দান নদীর পশ্চিম থেকে অবস্থিত। পশ্চিম তীরের পুরো এলাকা জর্দান পর্বতমালার উঁচু-নিচু পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত।জর্দান নদী ফিলিস্তিনের পূর্ব দিকে অবস্থিত,যা ফিলিস্তিন ও জর্দানের সীমান্তও।জর্দান নদী গোলান পর্বতমালা থেকে শুরু হয়ে সি অফ গ্যালিলিতে যায় তারপর সেখান থেকে মৃত সাগরে প্রবাহিত হয়। সি অফ গ্যালিলির পাশে অবস্থিত গ্যালিলি আপার জর্দান ভ্যালি ও জারজিল ভ্যালি চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। সি অফ গ্যালিলি পানযোগ্য পানির অনেক বড় উৎস।পশ্চিম তীরের সঙ্গে অবস্থিত ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকা শ্যারেন প্লেন।এই এলাকাও চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।পশ্চিম তীরে রয়েছে জেরুজালেম শহর,যাতে তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থান রয়েছে।জেরুজালেম বা ‘আল কুদস ’ ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।এটি পূর্বদিক থেকে ‘জায়ন’ ও পশ্চিম দিক থেকে ‘জয়তুন’ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ‘জায়ন’ অর্থ ’রৌদ্রোজ্জ্বল’ ।এ পাহাড়ের নাম তাওরাত ও ইঞ্জিলেও এভাবে বর্ণিত আছে।

১৩৬৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল ফিলিস্তিনের ৭৮% ভূমি দখল করে সেখানে তারা ইহুদীরাষ্ট্র কায়েম করে। গাজা এলাকা তখন মিশরের অধীনে ছিল আর পশ্চিম তীর ছিল জর্দানের অধীনে। তবে ১৯৬৭ সালের আরব- ইসরাঈল যুদ্ধে ইহুদীরা আরবদের কাছ থেকে গাজা এবং পশ্চিম তীর ছিনিয়ে নেয়।

আল-কুরআনে এই অঞ্চলকে মোবারক ভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে প্রচুর ফল-ফলাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করে রেখেছেন। ধর্মীয় সমৃদ্ধিও এই বরকতের অন্তর্ভুক্ত।এই ভূমিতে জন্ম নিয়েছেন অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম।অনেক রিসালাত আর নবুওয়াতের উৎস এই ভূমি।দুনিয়াবী বরকতের কথা চিন্তা করলে স্মরণ করতে হয় এর উর্বর ভূমি, সুপেয় পানি আর নির্মল আবহাওয়াকে।ফল আর শস্যের প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত আল্লাহর এই বরকতময় এলাকা।লুত (আ.) আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এই ভূমিতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ

"অতঃপর আমি তাকে এবং লুতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি দুনিয়াবাসীর জন্য অনেক বরকত রেখেছি।"

(সূরা আল-আম্বিয়া:আয়াত ৭১)।

এই এলাকার বরকতের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে বাইতুল মাকদিস বা মসজিদুল আকসা-মুসলমানদের প্রথম কিবলা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে যে তিনটি মসজিদপানে বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতে বলেছেন তার তৃতীয়টি হচ্ছে এই মসজিদুল আকসা। এখানে নামায পড়ার সওয়াব পাঁচশগুণ বেশি।এখান থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মিরাজ-

যাত্রা শুরু করে সর্বোচ্চ আসমানে পৌছেন। সেখানেই তিনি সমস্ত আম্বিয়া কেরামের ইমামতী করেন।বরকতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই ভূমিতে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল থাকবে যারা হকের উপর অটল থাকবে।

ফিলিস্তিন হচ্ছে মানবজাতি কর্তৃক আবাদ করা সর্বপ্রথম ভূমিগুলোর একটি। আধুনিক যুগের নৃতাত্ত্বিকগণ গবেষণা চালিয়ে দেখেন যে এখানেই মানবজাতি ভবঘুরে জীবন বাদ দিয়ে কৃষিকর্মের সাথে পরিচিত হয়ে কোথাও স্থির হয়ে বসবাস করা শুরু করে।আর তা শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব নবম সহস্রাব্দীতে।তাদের জানামতে সর্বপ্রাচীন নগরী আরিহা আবাদ হয়। এখনো আমরা ফিলিস্তিনে বিভিন্ন সভ্যতা এবং ধর্মের মিলনমেলা দেখতে পাই।

ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ফিলিস্তিন ভূমি মুসলমানদের কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাপ্রবাহ।ইসলাম আগমনের আগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করতেন তৎকালীন সময়ের আসমানী ধর্মের অনুসারীরা।হজরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, দাউদ, সুলাইমান ও ঈসা আলাইহুমুস সালামের ধর্মের অনুসারীরা এই ভূমিতে বসববাস করতেন। এছাড়াও আরও অনেক নবীর আবাসস্থল ছিলো ফিলিস্তিন।

ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা' আলা মসজিদুল আকসার কথা তুলে ধরেছেন,এখান থেকেই সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মিরাজ।

ইসলামের সূচনাকালে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করতেন মুসলিমরা।তাই মুসলমানদের প্রথম কিবলা বলেও পরিচিত পবিত্র এই মসজিদ। উমাইয়া,আইয়ুবী,সেলজুক,মামলুক, উসমানীওসহ বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিলো মুসলিমদের অধীনে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দের দিকে সাম নৃগোষ্ঠীর আরবরা সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন আবাদ করে।কেনআনি আরবরা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে এখানে নতুন করে আবাসন গড়ে তোলে।এরপর থেকে বহিরাগত বিভিন্ন জাতি এই অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে হয়তো নিজেরা থেকে যায়,নতুবা নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০-এর মধ্যে কেনআনি, আমোরী, ইয়াবুসি,জারজাসিওন এবং আমাকেরা এখানে আগমন করে।খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০-এর দিকে মিশরীয় এই অঞ্চলকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। রোভানিয়নরা খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০-এর দিকে, হিট্টিরা খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০-এর দিকে,হোরিয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-এর দিকে,ফিলিস্তিনিরা খ্রিষ্টপূর্ব ১১৯১-এর দিকে,বনী ইসরাঈলরা খ্রিষ্টপূর্ব ১২২০-এর দিকে,আশুরীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫২ এর দিকে,ব্যাবিলনীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ এর দিকে,পারসিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯-এর দিকে,গ্রিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২-এর দিকে,রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩-এর দিকে, বাইজান্টাইনরা ৫৯৩-৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, মুসলমানরা ১৫ হিজরী অর্থাৎ ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।

নিম্নে ফিলিস্তিনের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

· ৬৩৬ সালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমানদের হারিয়ে দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।এতে করে তাদের জন্য শাম ও আফ্রিকার দরজা খুলে গেল।

· সাহাবারা যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন তারা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র তিন হাজার জনের একটি ছোট বাহিনী। ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নিজে এসে প্রধান পাদ্রি প্যাট্রিয়ার্ক সফ্রেনিয়াস থেকে নগরের চাবি বুঝে নেন।অতঃপর তাদের সাথে একটি লিখিত চুক্তি সই করেন।এই চুক্তি ইতিহাসে 'ওমরী চুক্তি' নামে বিখ্যাত।এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইহুদীদের বের করে দেওয়া হয়।

· ৪৯৩ হিজরী/১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে তাকেই ক্রুসেডারদের রাজধানী ঘোষণা করে।

· ৫৮৩ হিজরী/১১৮৭ সালে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন হিত্তিনের যুদ্ধে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

· ৬৫৮ হিজরী/১২৬০ সালে আইনজালুতের যুদ্ধে মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয তাতারদের পরাজিত করে প্রথমবারের মতো তাদেরকে কোনো যুদ্ধে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করান।তারা কোনোমতে পিছিয়ে গিয়ে নিজেদের পিঠ রক্ষা করে। এতে করে মুসলিমবিশ্ব বাড়তি পতনের বিপদ থেকে মুক্ত হয়।

· ১৩৩৬ হিজরী/১৯১৭ সালে তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে ব্রিটিশরা জেরুজালেম প্রবেশ করে বেলফোর ফরমান জারি করে।এর অর্থ হলো এখন থেকে ফিলিস্তিন হবে ইহুদীদের রাষ্ট্র।

· ১৩৬৮ হিজরী/১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের ৭৮% এলাকা নিয়ে ইসরাঈলরাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়।

· ১৩৮৭ হিজরী/১৯৬৭ সালে ইসরাঈল সম্মিলিত আরব বাহিনীকে পরাজিত করে ফিলিস্তিনের বাকি অংশের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও নবী রাসূলগণ

১।কেনআনি সম্প্রদায় :যতগুলো সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে বসবাস করেছে তাদের মধ্যে কেনআনি সম্প্রদায় সর্বাধিক পুরোনো।তাদের স্মৃতিচিহ্ন আজও ফিলিস্তিনে বিদ্যমান।কেনআনি সম্প্রদায় আনুমানিক ৪ হাজার ৫০০ বছর আগে আরব উপদ্বীপ থেকে এ অঞ্চলে আগমন করে।এ কারনে ফিলিস্তিনকে প্রাচীন ইতিহাসে 'আরদে কেনআন' বলা হয়।

২।ইয়াবুসি সম্প্রদায় :আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত থেকে দেশত্যাগ করা গোত্রগুলোর মাঝে 'ইয়াবুসি' সম্প্রদায়ও ছিল।আল কুদস নগরী গড়ে ওঠার আগেই এই সম্প্রদায় এখানে বসবাস শুরু করেছিল।এ কারণে 'আল-কুদস' নগরীকে তাদের নামের দিকে সম্বন্ধিত করে 'ইয়াবুস' ও বলা হতো।

৩।ফিলিস্তিনে ইবরাহীম (আ.):
মধ্যব্রোঞ্জ যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০-১৫৫০) ৪৫০ বছরের এই ধাপটি ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।এ যুগেই ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনে তাওহীদের প্রদীপ নতুন করে

প্রজ্বলিত হয়।কেননা, নূহ (আ.)-এর জামানায় প্লাবনে সব ধ্বংস হয়ে গেলে তিনিই সর্ব প্রথম তাওহীদের বাণী প্রচার শুরু করেন।যখন তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০০) ফিলিস্তিনে আসেন তখন ছিল হেকসোসদের শাসনামল।তারা মূর্তিপূজারী হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল।তারা ইবরাহীম আ. কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেয়।এখানেই হযরত ইসমাঈল আ. এর জন্ম।এ হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফিলিস্তিনের শেকড়ের সম্পর্ক।ইসমাঈল আ. এর জন্মের ১৩ বছর পর ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব আ.।ফিলিস্তিনের ইতিহাসে তিনি বেশ তাৎপর্যের অধিকারী।ইবরাহীম আ. এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব আ. জন্মগ্রহণ করেন।একসময় ইয়াকুব আ. হিজরত করে বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চল হাররানে চলে যান।সেখানে তার এগার সন্তানের জন্ম।পরে আবার তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করেন।ইয়াকুব আ. এর আরেক নাম ইসরাইল (অর্থ আল্লাহর বান্দা)।সেই হিসেবে তার বংশধরদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয়।ইউসুফ আ. একসময় ইয়াকুব আ. কে সপরিবারে মিশরে নিয়ে যান।ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইয়েরা প্রায় ১৫০ বছর মিশরে বসবাস করেন।সেটা ছিল হেকসোসদের আমল। আগেই বলা হয়েছে,তারা ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

একসময় ফারাও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আহমোসের কাছে হেকসোসরা পরাজিত হয়।ফারাওরা বনী ইসরাইলকে মনে করত হেকসোসদের সহযোগী।তাই বনী ইসরাইলের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুম-নির্যাতন।এ নির্মমতা চলে ৩ শ বছর পর্যন্ত।এই সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে ব্যাপক ধস নামে,যেসব স্বভাব-চরিত্রে বর্তমানে আমরা তাদের চিনি।ভয়, লাঞ্ছনা, মিথ্যা তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়।একপর্যায়ে তারা তাওহীদ ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়।

৪। ফিলিস্তিনে বনি ইসরাইল : হজরত ইসহাক (আ.)-এর সন্তানের নাম ইয়াকুব (আ.)।তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি তুরস্কে হিজরত করেন।কয়েক বছর পর আবারো তিনি ফিলিস্তিনে আগমন করেন।ইয়াকুব (আ.) এর আরেক নাম ইসরাইল (আ.)।তার বংশধরকেই বনি ইসরাইল বলা হয়। ফিলিস্তিনে তখন হেকসোসদের শাসন চলছিল।এক সময় সম্রাট আহমোস ফিলিস্তিনে হামলা করলে হেকসোসরা পরাজিত হয়।আর সম্রাট আহমোস বনি ইসরাইলকে মনে করে হেকসোসদের সহযোগী।তাই তাদের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুম ও নির্যাতন।এ অত্যাচার চলে প্রায় তিনশত বছর পর্যন্ত।আর বনি ইসরাইলের চরিত্রে নেমে আসে ব্যাপক ধস।তারা এক পর্যায়ে লিপ্ত হয় মূর্তিপূজায়। যে চরিত্রে বর্তমানে আমরা তাদের চিনি তারা এমন নয়।তারা ছিল মূলত উত্তম চরিত্রের অধিকারী একদল সম্প্রদায়।

৫।ফিলিস্তিনে মূসা (আ.) :শত শত বছর অত্যাচারী বাদশাহগণ বনি ইসরাইলের ওপর নানান জুলুম ও নির্যাতন চালায়। অবশেষে তারা অতিষ্ঠ হয়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করে মিশরের সিনাই উপত্যকায় আসে।আর সেখানে ছিলেন হজরত মূসা ও হারুন (আ.)।ইসরাইলিরা মূসা ও হারুন (আ.) কে যারপরনাই কষ্ট দেয়।আল্লাহর নির্দেশে হজরত মূসা (আ.) খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বাইতুল মাকদিসে রওয়ানা হন।তবে সেখানে অত্যাচারী কেনআনিদের বসবাস থাকায় বনি ইসরাইল শহরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়।আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় তারা তীহ প্রান্তরে পাগলের মতো ঘুরতে থাকে।তীহ প্রান্তরে থাকা অবস্থায়ই হজরত মূসা (আ.) ইন্তেকাল করেন।

৬।ফিলিস্তিনে ইউশা (আ:) :হজরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলের নেতৃত্বের ভার আসে হজরত ইউশা (আ.) এর ওপর।তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী সালে বনি ইসরাইলদের নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।তখন কেনআনিদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।সেই যুদ্ধে বনি ইসরাইল বিজয় লাভ করে এবং ইউশা (আ.) তাদের নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে।তার জীবদ্দশায়ই বনি ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।একসময় হজরত ইউশা (আ.) ইন্তেকাল করেন।আর তাদের মাঝে ছড়িয়ে পরে পৌত্তলিকতা।চরমে পৌঁছে তাদের অবাধ্যতা।তারা হারিয়ে ফেলে মূসা (আ.) এর লাঠি।

৭।ফিলিস্তিনে দাউদ (আ.) :ফিলিস্তিনে একাদশ শতাব্দীর শেষে শাওল ইবনে কায়স (তালুত) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।তখন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়।তাদের সেনাপতি ছিল জালুত।যুদ্ধের এক পর্যায়ে হজরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেন।তালুতের ইন্তেকালের পরে দাউদ (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন এবং ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বড় ইহুদিবাদি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ঈমান ও আহলে ঈমানের আধিপত্য।

৮।ফিলিস্তিনে সুলায়মান (আ.) : হজরত দাউদ (আ.) ফিলিস্তিনে ৪০ বছর শাসন করেন।তার ইন্তেকালের পরে হজরত সুলায়মান (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।তিনি বেশ দাপটের সাথেই শাসন কার্য পরিচালনা করেন।তার প্রভাবে ইসরাইলিরা নুইয়ে পড়ে।তিনি জীনদের দ্বারা বাইতুল মাকদিসকে সংস্কার করেন। সুলায়মান (আ.) এর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র বিভক্ত হয়ে যায়। এক জনে নেতৃত্ব দেন ১০ গোত্রের আরেকজনে নেতৃত্ব দেন ২ গোত্রের।১০ গোত্র ফিলিস্তিনের উত্তরে আর ২ গোত্র ফিলিস্তিনের দক্ষিণে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। বিশৃঙ্খলা ও একগুঁয়েমিতে ছিল উভয় গোত্রই বরাবর।মিশরের সম্রাট শিশাংক খ্রিষ্টপূর্ব ৯২০ সালে উত্তর অঞ্চলের ওপর হামলা করে দখল করে নেয় আর ৭২১ সালে অ্যাসিরিয়ানরা (আশুরিয়া) দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর আক্রমন করে দখল করে নেয়। আর ধ্বংস হয়ে যায় ২০০ বছরের ইসরাইলি সাম্রাজ্য।

বিভিন্ন শাসনামলে আল আকসা

ফিলিস্তিনে বুখতে নসরের আক্রমণ : শিশাংক ও অ্যাসিরিয়ানদের আক্রমণে ইহুদী সম্প্রদায়ের কোমর ভেঙে যায়।তবে ইহুদীদের ইয়াহুযা সম্প্রদায় ভাঙা কোমর নিয়ে আরো ১৫০ বছর মাকদিস শাসন করে।খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ইরাকের সেনাপতি বুখতে নসর আবারও তাদের ওপর তাণ্ডবলীলা চালায়।ধ্বংস করে মসজিদে আকসা।বন্দি হয় প্রায় ৪০ হাজার ইহুদি।আর চিরতরে অবসান ঘটে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যের।ফিলিস্তিনে ইহুদীদের শাসনকাল ছিল মোট ৪১৮ বছর,যার মধ্যে সুলায়মান (আ.) ৮০ বছর ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করেন।আর বাকি ৩৩৮ বছর ছিল ফিতন-ফ্যাসাদ ও জুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত।আর ইহুদীরা এ শাসনকেই বুনিয়াদ বানিয়ে এ দাবি তুলছে,যে তারাই ফিলিস্তিনের বেশি হকদার।

ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন ও পারসিক শাসন : ইহুদী সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ব্যাবিলন শাসনের গোড়াপত্তন হয়।খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সাল থেকে ৫৩৯ সাল পর্যন্ত এ শাসন স্থায়ী হয়।পারসিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইহুদীদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে।ব্যাবিলনদের ব্যাবেল শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গোটা ফিলিস্তিনকে পারসিকরা দখলে নেয়।প্রায় ২০৭ বছর চলে তাদের শাসনকার্য।

ফিলিস্তিনে রোমান শাসন :রোমান সেনাপতি আলেকজেন্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে পারসিকদের পরাজিত করে। ইহুদীরা পারসিকদের থেকে ভালো সুবিধা না পাওয়ায় রোমানদের যুদ্ধে সার্বিক সহোযোগিতা করে।এমনকি কোনো কোনো ইহুদি রোমানীয়দের ধর্মও গ্রহণ করে। রোমানরা ফিলিস্তিন বিজয়ের পর সর্বপ্রথম তাকে রোমের অধীনে নিয়ে আসে,যা পরবর্তী সপ্ত শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাইজেন্টাইনের অধীনে ছিল।

ফিলিস্তিনে ঈসা (আ.) : ফিলিস্তিনে রোমানীয়দের শাসনকালেই ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।ফিলিস্তিনিরা ৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফুরীর অভিযোগ আনে।রোমান সম্রাট এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে শূলীতে চড়ায়,যা ইহুদি মতাদর্শে তাদের হাতে তার প্রাণ চলে যায়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়।বরং আল্লাহ কুদরতিভাবে তাকে উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে গেছেন।

ইহুদীদের বিদ্রোহ ও রোমান শাসন : হজরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ১০০ বছর পর আবারও শুরু হয় ইহুদিদের বিদ্রোহ।১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বারবুখা এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের আক্রমণে ইহুদীরা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। আর হাদ্রিয়ানের সেনাবাহিনী দখলে নেয় আল কুদসের পুরো ইহুদী অঞ্চল।চালায়

ধ্বংসের স্টিমরোলার।এ ঘটনার পর থেকে ইহুদীরা আর কখনোই বিদ্রোহের চেষ্টা করেনি।তখন থেকে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল-কুদস রোমানদের অধীনেই থাকে।

ফিলিস্তিনে উমাইয়া ও আব্বাসী
খেলাফত :

হজরত মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া খেলাফত। ৪১-১৩২হি:/৬৬০-৭৫০খ্রি. পর্যন্ত চলে তাদের শাসনকাল।সেই সময়টা ছিল ফিলিস্তিনিদের উন্নতি ও অগ্রগতির বসন্ত কাল।১২৯ হি: ভূমিকম্পে মসজিদে আকসার বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন উমাইয়া খলিফার নেতৃত্বে দ্রুত মসজিদটির মেরামত করা হয়।উমাইয়া শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আল আকসা ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।বেশ কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আল আকসা কমপ্লেক্সে।১৩২ হি: উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে,প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসী খেলাফত।১৩২-৬৬৫ হি: পর্যন্ত চলে তাদের শাসন।উমাইয়াদের পর আব্বাসীয় শাসকরাও আকসার পৃষ্ঠপোষকতা জারি রাখে।তাদের শাসনামলেও অনেক সংস্কার হয়।খলিফা হারুনুর রশিদ ও তার ছেলে মাহদী এই মসজিদ পরিদর্শনে আসে।সেখানকার জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।কিন্তু রাজধানী বাগদাদ থেকে আল আকসার অবস্থান দূরে হওয়ায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে কিছু শিথিলতা আসে।এর সুযোগ নিয়ে কুচক্রী শিয়া ইসমাঈলিয়া গোষ্ঠী ফিলিস্তিন দখল করে নেয়।প্রায় একশত বছর আল আকসা তাদের শাসনাধীন ছিল।এসময় ভ্রান্ত শিয়া মতবাদ প্রচারের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করা হয় আল আকসাকে।

পরবর্তীতে সেলজুক সুলতানরা আল আকসা পুনরুদ্ধার করেন।এসময় নতুন করে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষাধারার প্রচলন নতুন করে শুরু হয়।লোকশ্রুতি আছে, ইমাম গাজালি এসময় কিছুকাল আল আকসায় অবস্থান করেছিলেন।

ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসন

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু সিরিয়া-ফিলিস্তিনে রোমান শত্রুদের দমনার্থে খেলাফত কেন্দ্র থেকে সেনা-অভিযান প্রেরণ করেন।প্রথম খলিফার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সময় বিলাদুশ শাম মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অবসান ঘটে রোমান আধিপত্যের।এসময় থেকে জেরুজালেমের ইসলামী যুগের সূচনা।

সফ্রেনিয়াসের আত্মসমর্পণ, জেরুজালেম বিজয়:

৬৩৪ সালে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ায় সেনা অভিযান জোরদার করেন।৬৩৬ সাল নাগাদ রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারে বড়োসড়ো অভিযান শুরু করে।এই বছরের আগস্টে ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অক্টোবরের শুরুতে সিরিয়ায় নিযুক্ত ইসলামী সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ আমিনুল উম্মাহ আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু খলিফার নির্দেশে ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেন।জাবিয়া থেকে জেরুজালেমের উদ্দেশে মার্চ করে ইসলামী বাহিনী। নভেম্বরের প্রথমদিকে ইসলামী যোদ্ধারা জেরুজালেমের নগরপ্রান্তে উপনীত হন। বাইজেন্টাইন বাহিনী নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়।ইয়ারমুক যুদ্ধের পর জেরুজালেম সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।ইসলামী যোদ্ধারা শহরের সমস্ত প্রবেশপথ দখল করে পার্শ্ববর্তী পেল্লা ও বসরা দখল করলে শহরটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।পারসিকদের নিকট থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের পর হেরাক্লিয়াস এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করেছিলেন।ইয়ারমুক পরাজয়ের পর শহরের রোমান গভর্নর পেট্রিয়াক সফ্রেনিয়াস এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পুনঃসংস্কার করেন।পবিত্র ভূমির (ارض المقدس) মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী যোদ্ধারা রক্তপাত এড়াতে শহরের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের বদলে অপেক্ষা করছিলেন খ্রিষ্টান বাহিনীর রসদ ঘাটতির। অন্যদিকে চার মাস অবরুদ্ধ থাকার পর রোমানরা হেরাক্লিয়াসের কাছ থেকে সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে জিজিয়ার শর্তে আত্মসমর্পনে সম্মত হয়।সফ্রেনিয়াস শর্তারোপ করেন খলিফাকে নিজে এসে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।খ্রিষ্টানদের এই শর্ত মোতাবেক খলিফা দারুল খেলাফত (মদিনা তাইয়্যেবা) থেকে জেরুজালেম যাত্রা করেন।৬৩৭ সালের এপ্রিলে শত শত মাইল মরুসাগর পাড়ি দিয়ে খলিফা পৌঁছেন ফিলিস্তিনে। সাদাসিধে পোশাকে উটের লাগাম হাতে একজনমাত্র ভৃত্য সহযোগে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু শহরে প্রবেশ করলে নগরবাসী বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে।সানন্দে তারা খলিফার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে।জিজিয়ার বিনিময়ে ভিনধর্মীদের নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।মুসলিম পক্ষে খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বাক্ষর করেন চুক্তিপত্রে।খালিদ বিন ওয়ালিদ,আমর ইবনুল আস,আব্দুর রহমান বিন আওফ ও মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুম হন

চুক্তির সাক্ষী।খ্রিষ্টান পক্ষে ছিলেন সফ্রেনিয়াস ও অন্যান্যরা।ছয়'শ বছরের নিপীড়নমূলক রোমান শাসনের পর জেরুজালেম ১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কাগজে-কলমে মুসলিমদের অধিকারে আসে এবং এই প্রথম ইহুদীরা এখানে 'নাগরিক' হিসেবে বসবাস ও উপাসনার অনুমতি পায়।

সাইয়্যেদুনা ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা

"পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ'র নামে ঘোষণা করা হচ্ছে,আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মু'মিনীন ওমর জেরুজালেমের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছেন।নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তাদের জান, মাল,গির্জা,ক্রুশ,শহরের সুস্থ-অসুস্থ ও তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। মুসলিমরা তাদের গির্জা দখল বা ধ্বংস করবে না।তাদের জীবন এবং যে ভূমিতে তারা বসবাস করছে,তাদের ক্রুশ অথবা সম্পদ-ধ্বংস করা হবে না কোনোকিছুই। ধর্মান্তরিত করা হবে না জোরজবরদস্তি। কোনো ইহুদী তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না জেরুজালেম।

জেরুজালেমবাসী অন্যান্য শহরের মানুষের মতোই জিজিয়া (ট্যাক্স) প্রদান করবে এবং অবশ্যই বাইজেন্টাইন ও লুটেরাদের বিতাড়িত করতে হবে।জেরুজালেমের যেসব বাসিন্দা বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক,গির্জা ও ক্রুশ ছেড়ে নিজের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে চায়,আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পাবে। গ্রামের অধিবাসীরা চাইলে শহরে থেকে যেতে পারে এই শর্তে,শহরের অন্যান্য নাগরিকের মতো তাদেরকেও জিজিয়া প্রদান করতে হবে।যার ইচ্ছে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে পারে।যার ইচ্ছে থেকে যেতে পারে নিজের পরিজনদের কাছে।ফসল কাটার আগে তাদের থেকে নেওয়া হবে না কিছুই।
চুক্তি অনুযায়ী যদি তারা জিজিয়া প্রদান করে,তাহলে এই চুক্তির অধীনস্থ শর্তসমূহ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ,তাঁর নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের ন্যায় সমস্ত খলিফা এবং ঈমানদারদের পবিত্র কর্তব্য বলে ধর্তব্য।"

লিখিত বিভিন্ন মুসলিম দলিল মোতাবেক যোহরের নামাজের সময় সফ্রেনিয়াস ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে চার্চ অব দ্য হলি সেপালচারে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানান।কিন্তু এমন করার ফলে ভবিষ্যতে মুসলিমরা চুক্তি ভঙ্গ করে একে মসজিদে পরিণত করবে এই আশঙ্কায় ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাতে সম্মত হননি। জেরুজালেমে দশদিন অবস্থান করার পর খলিফা মদিনা তাইয়্যেবা ফিরে আসেন। জেরুজালেমে অবস্থানের সময় সফ্রেনিয়াস ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বেশ কিছু পবিত্র স্থান দেখাতে নিয়ে যান।এর মধ্যে টেম্পল মাউন্টও ছিল।এর দুরবস্থা দেখে তিনি এখানকার জঞ্জাল ও ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে একটি কাঠের মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন।গলের বিশপ আরকালফ ৬৭৯ থেকে ৬৮২'র মধ্যে জেরুজালেম ভ্রমণের সময় তার দেখা

মসজিদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে,এর বীমগুলো কাঠের তৈরি ও এটি নির্মাণ করা হয়েছিল পুরনো ধ্বংসাবশেষের ওপর। এখানে একসঙ্গে ৩,০০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারতেন।জেরুজালেম বিজয়ের ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর ৬৯১ সালে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক এটি পুনঃনির্মাণ করেন।পরবর্তীতে উসমানি খেলাফতকালে মসজিদটির আরো সংস্কার হয়।ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-আকসার বর্তমান কাঠামোটিও নির্মিত হয়েছে মুসলিম আমলে।

১৯ হিজরীতে মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর হাতে কায়সারিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাতে চলে আসে।মুসলমানদের আগমনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।শাম অঞ্চলের প্রথম মুসলিম গভর্নর ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু।তখন ফিলিস্তিনও শামের অংশ ছিল।১৮ হিজরীতে আমওয়াস মহামারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।তারপর মুআয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিও মহামারীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর গভর্নর নিযুক্ত হন ইয়াযীদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু।তিনিও মহামারীতে ইন্তেকাল করেন।এরপর মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু গভর্নর নিযুক্ত হন।উসমান রাদিআল্লাহু আনহু এর পুরো শাসনামল জুড়ে তিনি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।উসমান রাদিআল্লাহু আনহু এর খেলাফতের শেষের দিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।ওসব ফিতনায় শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায় না।ফিতনার ওই সময়টাতে তাঁরা মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে উমাইয়া খেলাফতের [৪১-১৩২ হিজরী/৬৬০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ] সূচনা হয়। এসময়টা ছিল ফিলিস্তিনের জন্য উন্নতি ও অগ্রগতির সময়।১৩২ হিজরী/৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে।প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসী খেলাফত।১৩২-৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত ৫২৪ বছর এ খেলাফত স্থায়ী হয়। ১৩২-২৪৭ হিজরী পর্যন্ত ১১৫ বছর ছিল আব্বাসী খেলাফতের সোনালী যুগ। ২৪৭-৬৫৫ হিজরী পর্যন্ত ৪০৯ বছর দুর্বলতার যুগ।উমাইয়াদের মতো আব্বাসীরাও ফিলিস্তিনকে খুব গুরুত্ব দিত। তবে সেটা উমাইয়াদের পর্যায়ে ছিল না। কারণ,উমাইয়াদের রাজধানী ছিল দামেশকে,যা আব্বাসীরা বাগদাদে স্থানান্তর করে।দূরত্বের কারণে যত্নে কিছুটা ঘাটতি পড়েছিল।

আব্বাসী খেলাফতের দুর্বলতার কালে আব্বাসীয় গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন ২৫৪ হিজরী/৮৬৮ ঈসাব্দে আব্বাসী শাসন থেকে বেরিয়ে যান।তিনি স্বাধীন তুলুনী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।২৬৪ হিজরী/৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিন অধিকার করেন। ফিলিস্তিন ৫৭ বছর তুলুনী রাজ্যের অধীনে ছিল।এ শাসনামলের সুনাম ইতিহাসে বেশ উজ্জ্বল।৩২১ হিজরীতে

মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।৩৮ বছর ইখশীদীরা ফিলিস্তিন শাসন করেন।এ আমল ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম শাসনামল বলে বিবেচিত হয়। ইখশীদী সুলতানেরা ফিলিস্তিনকে এতটাই গুরুত্ব দিত যে,কোনো খলীফার ইন্তেকাল হলে লাশ দাফন করতে মসজিদে আকসায় নিয়ে যেত।এতকিছুর পরও এ আমলে এসে ফিলিস্তিনে সামরিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদীদের পতনের পর এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে।

৩৫৯ হিজরীতে উবায়দিয়ারা মিশর দখল করে।একই বছর তারা ফিলিস্তিন দখল করে।তারা ছিল নিকৃষ্টতম শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী।কমবেশি একশ বছর তারা মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে।তারা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সুন্নী আলেমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে।উবায়দিয়াদের দখলের মধ্য দিয়ে এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে ফিলিস্তিন।উবায়দিয়ারা প্রথমে একাধারে ১০৪ বছর ফিলিস্তিন শাসন করে।ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াত শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে।সুন্নী উলামায়ে কেরামকে হত্যা করে।এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে মিশর ও ফিলিস্তিনে। উবায়দিয়া সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ৬০ বছরের শাসক মুস্তানসির লিদীনিল্লাহ এর আমলে উবায়দিয়ারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়- মুস্তালিয়া ও নিযারিয়া।

মুস্তানসিরের আমলেই ৪৩২ হিজরী/১০৪১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফগানিস্তান ও পূর্ব ইরানে তুর্কী বীর সালজুক ইবনে দুক্কাকের হাত ধরে সালজুক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে।এরা ছিল আকীদায় সুন্নী।৪৬৩ হিজরীতে সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে তুর্কী সেনাপতি আতসিয ইবনে উভাক উবায়দিয়াদের হাত থেকে ফিলিস্তিন উদ্ধার করেন।তবে এই সেনাপতি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করে সেলজুক শাসন থেকে আলাদা হয়ে যান।একপর্যায়ে আল্প আরসালানের ছেলে তুতুশ ইতযিসকে পরাজিত ও হত্যা করেন।তিনি তার এক সেনাপতি আরতুক ইবনে আকসাবকে ফিলিস্তিনের দায়িত্ব দেন।আরতুক ৪৭১-৪৮৯ হিজরী পর্যন্ত ১৮ বছর ফিলিস্তিন শাসন করেন।দীর্ঘ দুঃশাসনের পর এই সময়টা ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই উত্তম সময়। তুতুশ জালিম হলেও তার নিযুক্ত শাসক আরতুক ছিলেন খুবই ন্যায়পরায়ণ।

৪৮৯ হিজরীতে ৩ বছরের জন্য উবায়দিয়াদের মুস্তালিয়া ফেরকা আবার ফিলিস্তিন দখল করে।সুকমান ইবনে আরতুক ও গাজী ইবনে আরতুককে ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করে।তাঁরা তুরস্কের দক্ষিণে হিজরত করেন।সেখানে তাঁরা আরতুক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে বিশাল অবদান।এবারও উবায়দিয়ারা সুন্নী আলেমদের হত্যায় মেতে ওঠে।

ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন

এবার নতুন আগ্রাসনের কবলে পড়ে উবায়দিয়ারা।ধেয়ে আসে ক্রুসেডাররা। ৪৯০ হিজরী/১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়।ক্রুসেডাররা প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে।তারা খুব সহজে কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে। কারণ,তখন তিনি ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্যস্ত ছিলেন গাজী ইবনু দানেশমান্দকে পরাজিত করতে।তখন সালজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তাছাড়া উবায়দী শিয়াদের দীর্ঘ গোমরাহীপূর্ণ শাসন মুসলিম চেতনাকে মিইয়ে দেয়।এসব কিছু ক্রুসেডারদের জন্য ফিলিস্তিন প্রবেশ সহজ করে দেয়।

৪৯২ হিজরী/৭ জুন ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা আলকুদসে পৌঁছে।পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে।২০ শাবান ৪৯২ হিজরী/১৫ জুন ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আলকুদসের পতন ঘটে।ক্রুসেডাররা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে।৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে।পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ক্রুসেডারদের আনাগোনায় এ পর্যায়ে এসে মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।৪৯০ হিজরীতে রুহা রাজ্য, ৪৯১ হিজরীতের আন্তাকিয়া রাজ্য,৪৯২ হিজরীতে বাইতুল মাকদিস রাজ্য, ৫০৩ হিজরীতে তারাবলুস ও তার আশপাশ মিলিয়ে আরেকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।৭ মুহাররম ৫০৭ হিজরী/১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বীর মওদুদ ইবনে তুনকাতিনের হাতে সিন্নাবরাহ রণাঙ্গনে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়।এ যুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন যিনকীর।তখন তার বয়স ২৪ বছর।তিনি এতিম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন।

ইমাদুদ্দীন যিনকী ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন।৫৩০ হিজরী/১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লাযিকিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন।অকল্পনীয় গণীমত লাভ করেন।এরপর একে একে তিনি মুসলিম বিশ্বে গজিয়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন।এভাবে সূচিত হয় যিনকী সাম্রাজ্যের ভিত্তি।৫৪১ হিজরীতে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন।রেখে যান চার সন্তান।এর মধ্যে নুরুদ্দীন যিনকী ও সাইফুদ্দীন গাজী বাবার অসমাপ্ত মিশন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।৫৪৫ হিজরী পর্যন্ত নুরুদ্দীন রাহ. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন।৫৪৮ হিজরীতে দুঃখজনকভাবে আসকালান ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। আসকালান ছিল ফিলিস্তিনের একমাত্র স্বাধীন মুসলিম অঞ্চল।যদিও শাসকরা ছিল উবায়দী।তারা নুরুদ্দীন রাহ.-এর কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠায়।মাঝখানে প্রতিবন্ধক ছিল দামেশকের শাসক।তাই তিনি প্রথমে

দামেশক জয় করেন।তিনি ফিলিস্তিন জয় করতে মিশরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।আল্লাহ তাআলা সে ব্যবস্থাও করে দেন।উবায়দী শাসক আলআযিদ বিল্লাহ ২৭/২৮ বছর বয়সী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে মিশরের প্রধানমন্ত্রী বানান। তার ধারণা ছিল,তরুণ আইয়ুবীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন।কিন্তু সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর দৃঢ়তায় তার এ খায়েশ ভেস্তে যায়।তিনি ৫৬৭ হিজরী/১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২০৮ বছরের ওবায়দী শাসনের বিলুপ্তি ঘটান।উবায়দীরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে আতাত করে বহুবার মিশর দখল করতে চাইলেও তা ব্যর্থ হয়। এর মাত্র ২ বছর পর ১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরীতে নুরুদ্দীন রাহ.দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

নুরুদ্দীন রাহ. এর মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন আইয়ুবী জিহাদের হাল ধরেন।বিভক্ত মুসলিম রাজ্যগুলোকে একীভূত করেন। ২৪ রবিউল আউয়াল ৫৮৩ হিজরী/৪ জুলাই ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।এ যুদ্ধে মুসলমান ছিল মাত্র ১২ হাজার।ক্রুসেডার ছিল ৬৩ হাজার। যুদ্ধের ফলাফল কল্পনাতীতভাবে মুসলমানদের অনুকূলে ছিল।হিত্তীন যুদ্ধের পরের দিন টাইবেরিয়াসের সবচেয়ে বড় দুর্গ জয়ে রওয়ানা হন।সহজেই তা বিজয় করেন।হিত্তীন যুদ্ধের ৫ দিন পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আক্কা অবরোধ করেন।এক দিনের মধ্যেই এই শহরের পতন ঘটে।আক্কার পর তিনি নাসিরিয়া জয় করেন।সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ইয়াফা ও নাবলুস শহর জয় করেন। এসব ঘটনা হিত্তীন বিজয়ের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে।এরপর তিনি লেবানন অভিমুখে রওয়ানা হন।লেবাননের অর্ধেক তখন বাইতুল মাকদিস রাজ্যের অধীনে ছিল।তিনি চাচ্ছিলেন বাইতুল মাকদিস রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে।২১ জুমাদাল উলা তিনি সাইদা গিয়ে পৌঁছান।সাইদা জয় করে বৈরুত যাত্রা করেন।আট দিন অবরোধের পর বৈরুতের পতন হয়। জাবিলবাসী আত্মসমর্পণ করে।১৬ জুমাদাল উখরা আসকালান অবরোধ করেন।দুই সপ্তাহের মধ্যে আসকালানের পতন ঘটে।রামাল্লা অভিমুখে সৈন্য পাঠান। একে একে গাজা, তিবনিন, বেথেলহাম ও বাইত জিবরীন জয় করেন।আলকুদস বাদে গোটা ফিলিস্তিন তিনি মাত্র দুই মাসে জয় করে ফেলেন।

ফিলিস্তিনে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী(র.) এর যুগ

১৫ রজব ৫৮৩ হিজরীতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী(র.) আলকুদস অবরোধ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন।কিন্তু শহরের পাদ্রী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।সালাহউদ্দীন আইয়ুবী টানা ১২ দিন মিনজানিক দিয়ে অব্যাহত আক্রমণ করে যান।হামলার ভয়াবহতা দেখে ক্রুসেডাররা শান্তি প্রস্তাব করে।সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন,তোমরা দীর্ঘ ৯২ বছর মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করেছ,আমি তোমাদের সাথে সে আচরণই করব।

ক্রুসেডাররা জবাবে বলে,আমরা আমাদের সন্তান,নারী ও পশুদের হত্যা করব।তারপর বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেব।আমাদের হাতে বন্দী ৫ হাজার মুসলমানকেও জবাই করব।তারপর মরণপণ লড়াই করব।

এ জবাব শুনে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী দ্বিধায় পড়ে যান।পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বাইতুল মাকদিস হস্তান্তরের পর জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।২৭ হিজরী রজব মাসে আলকুদস শহর মুসলমানদের হাতে আসে।ক্রুসেডাররা মসজিদে আকসাকে এতটাই অপরিচ্ছন্ন করেছিল যে,তা পরিষ্কার করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়।সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এ বছর ঈদুল আযহা আল-কুদসে উদ্যাপন করেন।

৫৮৫ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝিতে ক্রুসেডাররা গাই ডি লুসিগনানের নেতৃত্বে সুরের নিকটবর্তী শহর আক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে।লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী আট মাস বন্দি রাখার পর মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সুরে গিয়ে পরাজিত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়। ওয়াদা ভঙ্গের দরুন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী খুবই ক্ষিপ্ত হন।তিনি আক্কায় পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা আক্কায় পৌঁছে যায় এবং শহর অবরোধ করে।ক্রুসেডারদের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল শক্তিমত্তার দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ব্যর্থ হন।পূর্ণ দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এর মধ্যে বাইতুল মাকদিসে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার জন্য ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়।এটা ছিল তৃতীয় বৃহত্তম ঐক্য। প্রথম ঐক্য ছিল প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সময়।যা খুবই সফল হয়েছিল। তাদের মাঝে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐক্য হয়েছিল রুহা রাজ্যের পতনের পর।ক্রুসেডের এ অভিযান নুরুদ্দীন যিনকী ব্যর্থ করে দেন। এর কোনো ফলাফল ছিল না।আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইয়াফা,আসকালান,কায়সারিয়া, আরসোফ,হাইফা

ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়।২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে মহাবীর সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ইন্তেকাল করেন।

ষোল শতকের শুরুর দিকে আল আকসা উসমানীয় খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। অটোমান শাসকরা মক্কা,মদিনায় অবস্থিত পবিত্র দুই মসজিদের মতোই আল আকসার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ তৎপর ছিলেন।আল আকসার প্রতি সুলতান সুলাইমান আল কানুনীর বিশেষ নির্দেশনা ছিল।শেষ স্বাধীন উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদও ইহুদীদের নানামুখী কূট-ষড়যন্ত্র এবং প্রলোভনের মুখে আল আকসা রক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় ছিলেন।

সর্বশেষ উসমানীয় খেলাফত বিলুপ্তির পর আল আকসাবাসীর ভাগ্যে নেমে আসে নতুন দুর্যোগ।সে দুর্যোগ এখনও চলমান। এখন আল আকসায় দুই রাকাত নামাজ পড়তেও প্রয়োজন হয় ইহুদী সেনাদের ছাড়পত্র।

ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ফিলিস্তিনের খ্রিষ্টান নেতাদের কাছে ক্ষমতা বুঝে নিতে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তা ইতিহাসে 'ওমরী-চুক্তি' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই চুক্তিতে তিনি স্পষ্ট করে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন।আমরা এমনটাও দেখেছি তাদের সর্বোচ্চ নেতা পেট্রিয়ার্ক সফ্রেনিয়াস যখন ইহুদীদের জেরুজালেমে প্রবেশ করার বিরোধীতা করেন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তার অনুরোধ উপেক্ষা করে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেই চুক্তি সম্পাদন করেন।তিনি তাদের বোঝাতে সক্ষম হন তাদেরকে এ শহরে প্রবেশ করতে না দেওয়াটা হবে আল-কুরআনের আদেশ লঙ্ঘন।হ্যাঁ, খ্রিষ্টানদের শান্তিতে বিঘ্ন না ঘটাতে তাদের খ্রিষ্টান কোনো মহল্লায় বসতি গড়ে তুলতে দেওয়া হবে না।

ইতিহাস সাক্ষী যে এ ধরনের স্বাধীনতা তারা যখন নাসারাদের অধীনে ছিল তখন তা কল্পনাও করতে পারত না।ক্রুসেডাররা প্রথমবারের মতো জেরুজালেমে প্রবেশ করতেই সবাইকে তাদের সিনাগগে বন্দি করে রাখে।এর পাশাপাশি তাদেরকে জেরুজালেমে ঢুকতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়।দীর্ঘ ৮৮ বছর পর সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (১১৩৭-১১৯৩) সেখান থেকে নিষ্ঠুর ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে তাদেরকে পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেন। মহান এই সুলতানের পুরো নাম ইউসুফ বিন আইয়ুব বিন সাযি আবুল মুযাফফর সালাহউদ্দীন আল-আইয়ুবী।আর তাঁর খেতাব ছিল আল-মালিক আন-নাসির।

এত কিছুর পরও যে জাতির ইতিহাস এবং অস্থিমজ্জা সবই অকৃতজ্ঞতায় ভরপুর, মুসলমানদের প্রতি তারা তাদের হিংসা-বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছিল।শুধুমাত্র অপেক্ষায় ছিল সুযোগের যে সুযোগে তারা মুসলমানদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিবে। খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।এদিকে খ্রিষ্টানরাও জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলিম-বিদ্বেষ ভুলে যায়নি।তারা তাদের সকল বুদ্ধি এবং বিকল্প শক্তির আশ্রয় নিয়ে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বংশধর যে কোনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে।তারা তাদের কাজ-কর্ম এবং বক্তব্যের মাধ্যমে এর প্রমাণ দিয়েই যাচ্ছে।ইতিহাস,আধুনিক এবং মধ্যযুগীয় সবই তার সাক্ষী বয়ে চলছে।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ক্রুসেডাররা যুগ যুগ ধরে নবী হত্যাকারী ইহুদী সম্প্রদায়কে সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে।তারা ইহুদীদের জন্য একটি আবাসভূমি খুঁজতে থাকে।এর জন্য প্রয়োজনে তারা যে কোনো মাধ্যম অবলম্বন করবে।এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা থিয়ডর হার্সেল নামের এক ইহুদী লেখককে (১৮৬০-১৯০৪) কাজে নামিয়ে দেয়।তাকে নতুন এক ইহুদীবাদী আন্দোলনের নেতা হিসেবে ফলাও করা হয়।এই লোককে শুধু যায়নবাদের প্রচারের জন্য লেখালেখি করতেই প্ররোচিত করা হয়নি,তাকে সুযোগ করে দেওয়া হয় সুইজারল্যান্ডের শহর বাসেল-এ একটি আন্তর্জাতিক ইহুদী সম্মেলনের আয়োজন করতে।এই সম্মেলনেই (১৮৯৭/১৩১৫) যায়নবাদের সূচনা হয়।এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদের নাম ভাঙিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।এ জন্য ধনাঢ্য ইহুদীরা নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রস্তুতির ঘোষণা দেয়।তবে এ কাজে ধনী-গরিব নির্বেশেষে সকল ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় খ্রিষ্টানরা।এর পেছনে তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই: ক্রুসেডের লজ্জাকর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া।

পরবর্তী ইতিহাসের নথিগুলো এই কথাই বলে যে বাসেল ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে সবই মিলে এক চতুর ইহুদীকে উসমানী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের (১৮৪২-১৯১৮) কাছে পাঠানো হয়।তার নাম ছিল ইমানুয়েল কারসো।এই ইহুদী সুলতানকে প্রস্তাব দিলো রুগ্ন উসমানী খেলাফতকে পঞ্চাশ কোটি পাউন্ডের মতো ধার দেওয়া হবে আর সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চাশ লক্ষ দেওয়া হবে যা তাঁর ব্যক্তিগত খাজানায় জমা হয়ে যাবে। তবে এ সবকিছুর বিনিময় একটাই,আর তা হলো ফিলিস্তিন এলাকায় তাদেরকে একটি ইহুদীরাষ্ট্র কায়েম করার অনুমতি দিতে হবে।

উসমানী খলীফার আত্মসম্মান:

ইমানুয়েল যখন তার প্রস্তাব নিয়ে যায় তখন তুরস্ক আর্থিক দিক দিয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।সমগ্র ইউরোপ তার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে বসে থাকে। এমতাবস্থায় বর্তমান নেতাদের মতো কেউ যদি সুলতান আব্দুল হামিদের জায়গায় থাকত তাহলে সে যে কি নীতি অবলম্বন করত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সুলতান যে জবাবটা মাক্কার ইমানুয়েলকে দেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তা সত্যি সত্যিই অতি গর্ব ও যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।তিনি বললেন,

"ডক্টর হাসেলকে বলেন এ বিষয়ে আজ থেকে আর চেষ্টা সাধ্য না চালাতে।এই রাজ্যের এক ইঞ্চি মাটিও আমি ছাড়তে প্রস্তুত নাই। অন্য কারো কাছে যাক... দেশ আমার কোনো একার মালিকানা নয়।এই মালিকানা দেশের জনগণের, তারাই তাদের রক্ত দিয়ে এই দেশকে আঁকড়ে ধরে উন্নত করেছে।ইহুদীরা তাদের লক্ষ-কোটি সোনাদানা নিয়ে বসে থাক।"

কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাদের সংলাপটা যত্ন সহকারে নথিবদ্ধ করে রাখেন,

"আমাদের এই দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে।আমরা যদি তাদের চেয়ে বেশি রক্ত দিয়ে এই দেশটাকে রক্ষা না করি তা হলে তা বেহাত হয়ে যাবে।যে ফিলিস্তিন পূর্বপুরুষরা তাদের রক্ত দিয়ে উদ্ধার করেছে সে ফিলিস্তিনে ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়ার অর্থ হলো…"

ব্যর্থ মনোরথে থিয়ডর ফিরে গেলেও সুলতান ফিলিস্তিনকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের মেঘ গর্জে ওঠার শব্দ শুনতে পেলেন। তাই ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার জন্য তিনি তড়িৎ কিছু শক্ত পদক্ষেপ নিলেন।সাথে সাথে রাজকীয় ফরমান জারি করলেন, ফিলিস্তিনে কোনো ইহুদী অভিবাসন গড়ে তুলতে পারবে না।তারপর সিরিয়ার প্রশাসন থেকে তাদের আলাদা করে দিলেন।তখন থেকে ফিলিস্তিন রাজধানীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আসে।এতে করে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে যেকোনো ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সুলতান নিজেই অবগত হবেন এবং তিনি অবস্থা বুঝে পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার কারণে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ও নবীহন্তা ইহুদীরা বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।এবার তারা পুরো মুসলিমবিশ্বকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগল।তারা পণ করল যেভাবেই হোক মুসলিমবিশ্বকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে হবে।ঐক্যের যেকোনো পথ বন্ধ করে দিতে হবে।তারা বড়সড় এক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল যা নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।এই ষড়যন্ত্র পুরো মুসলিমবিশ্বকে গ্রাস করবে।ফিলিস্তিন পেতে হলে তার পথের সমস্ত বাধা দূর করতে হবে যেকোনো মূল্যে।আর সবচাইতে বড় বাধা হচ্ছে সুলতান ও তার

খেলাফত।সুলতানকে আরশচ্যুত করতে হবে।না, এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না।খোদ উসমানী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে হবে।সত্যি সত্যি তাকে তারা আরশচ্যুত করল।তাকে কৌশলে ঠেলে দিলো একাকীত্বের দিকে। আর একাকীত্বের কারণে একসময় তিনি বিষণ্ণতার অবসাদ সইতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

উসমানী খেলাফতের বিলুপ্তি সাধন:

কোনো ধরনের ইশারা-ইঙ্গিতের আশ্রয় না নিয়ে হার্সেল সরাসরি বলেন,"ইহুদীদের জন্য পূর্বের দরজা খুলে দেওয়াটা নির্ভর করে শুধুমাত্র উসমানী খেলাফতের পতনের উপর।"

এই খেলাফত বিলুপ্তির দায়িত্বটা হাতে নিল ইহুদী সংগঠন ফ্রি-মেসন।তাদের ডান হাত হিসেবে এগিয়ে এল দুনমা ইহুদীরা।আর এই দুইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল খোদ ব্রিটিশ প্রশাসন।ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা আরব জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিলেন।তারা আরবদের বোঝাল, ওরাতো তুর্কি জাতি।তোমরা আরব জাতি, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে হেয় মনে করে তাই তারা আরবদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে।এভাবেই তারা চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে।এই ষড়যন্ত্রের সর্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল লরেন্স (১৮৮৮-১৯৩৫) নামের এক ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা।সেই আরবদের সাথে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সমন্বয় সাধন করত দক্ষতার সাথে।এ বিষয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় সে বেশ তৎপর ছিল।প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সে সখ্যতা গড়ে তোলে মক্কার গভর্নর শরীফ লকবধারী আল-হুসেইন ইবনে আলি আল- হাশেমির সাথে।১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সে কার্যকর ষড়যন্ত্র পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। সুপরিকল্পিতভাবে সে তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপাতে সমর্থ হয়।এতটাই সফল হয় যে বিশ্বের ডাকসাইটে পত্রিকাগুলো তাকে 'আরবের বেতাজ বাদশাহ' উপাধি দেয়।এই পত্রিকাগুলো স্পষ্ট বলে দেয় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট করে উসমানী খেলাফতকে ভেঙ্গে দেওয়া।লরেন্স ঘোষণা দেয়, "আমরা যদি আরবদেরকে আকস্মাৎ আর জোরপূর্বক তুর্কিদের কাছে থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করি তাহলে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করা যাবে। তাছাড়া মুসলমানরাই নিজেদের ঘরেই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে। এসব কিছুর প্রভাব তাদের খলীফার উপর পড়বে।এর প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না পুরো মুসলিমবিশ্বও।তারা তাদের বিরুদ্ধেই ধর্মীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।এতে করে ইসলাম নামের কোনো কিছু আর আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না।"

লরেন্সের মতো চৌকশ গুপ্তচররাই মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন ধরাতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানি আর তার মিত্ররা,অপরদিকে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স আর রাশিয়া।অবাক

করা ব্যাপার হলো আরবরা ছিল ব্রিটিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আরব বেকুবদের তখন বোঝানো হয়েছিল তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী থাকলে একমাত্র ব্রিটিশরাই আছে।তাই মজার ব্যাপার হলো ইহুদীরা যেমন ব্রিটিশদের পাশে ছিল আরবরাও তেমনি তাদের পাশে ছিল। ইহুদীরা ছিল উসমানীদের দাপ্তরিক দায়িত্বে।তাই তারা সে সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে উসমানী খেলাফতকে ভেতর থেকে অনেক দুর্বল করে দেয়।তারা ছিল প্রশাসনের চুক্তি ও সমঝোতা বিভাগের মতো স্পর্শকাতর বিভাগের দায়িত্বে।সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তারা বেশ তৎপর ছিল।তারা তুর্কি সমাজে নাস্তিকতার বীজ বুনতেও সক্ষম হয়।এতে করে খোদ তুর্কিদের বিরাট এক অংশ ধীরে ধীরে ইসলাম বিদ্বেষী সমাজে পরিণত হয়।এদের সাহয্যেই ইহুদীরা কোনো ধরনের লাভ ক্ষতির অংক না কষেই উসমানী খেলাফতকে জার্মানির পক্ষে লড়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখার দিকে ঠেলে দেয়।অবশেষে,তাদের পরিকল্পনামাফিক জার্মানি আর তার মিত্ররা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে যায়।জিতে ইংরেজ ও তার মিত্ররা।আর পরাজিতদের তারা নিজেদের ভাগবাটোয়ারা করে নেয় সাইকস পিকো (১৯১৬) চুক্তি অনুযায়ী। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় বিশাল উসমানী ভূখণ্ড।এভাবেই এই চুক্তির কল্যাণে ফিলিস্তিন চলে আসে ব্রিটিশ মেন্ডেটের অধীনে।

যায়নবাদের উৎপত্তি:

ফিলিস্তিনে ইহুদীদের একত্রিত করে ইসরাঈলীরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নই যায়নবাদকে অনুপ্রাণিত করে।এর সমর্থনে ছিল ইহুদী-খ্রিষ্টানরা,বিশেষ করে প্রটেস্টান্টরা। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে।অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা চূড়ান্ত পরিণতি অর্জন করে। এই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিগুলোর একটি ছিল ভিন জাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।এই সমস্যা প্রচণ্ড আকারে দেখা দেয় পূর্ব ইউরোপে ইহুদী বিদ্বেষী মনোভাবের মধ্যে। রাশিয়ানরা ইহুদীদের উপর তাদের জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।তবে এ সময়টাতে ইহুদীরা আবার ইউরোপ আর আমেরিকায় নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতেও সক্ষম হয়।এ সময় তাদের হাসকেলা নামের প্রগতিবাদী আন্দোলনও ব্যর্থ হয়।এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীরা যে যেই সমাজে আছে সেই সমাজেই যাতে তারা মিশে যেতে পারে।

ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক চিন্তা

এই চিন্তাই আরববিশ্বে স্থায়ী অশান্তি নিয়ে আসে।আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো-বিশেষ করে ব্রিটেন।তাদের পরিকল্পনা ছিল মুসলিমবিশ্বের হৃৎপিণ্ডের মাঝেই একটি ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।তার জন্য বেছে নেওয়া হয় এশিয়া আফ্রিকার মিলনস্থলকে।এতে করে এই ভিন জাতির রাষ্ট্রই মুসলমানদের মাঝে চিরস্থায়ী ফাটল ও চির ধরাতে সক্ষম হবে।এতে করে নতুন কোনো ইসলামী পরাশক্তির উত্থানও ঘটবে না।তখন কোনো ইসলামী সাম্রাজ্য এসে নিজেকে উসমানী সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত

হিসেবে ঘোষণা দিতে সক্ষম হবে না।তবে নতুন যে ইহুদীরাষ্ট্র গঠিত হবে তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নির্ভর করবে আশেপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা ও অনৈক্যের উপর।আর তার বিপরীত সত্যটাও মেনে নিতে হবে।যদি এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উন্নয়ন আর অগ্রতির ধারায় কোনোমতে উঠে যেতে সক্ষম হয় তাহলে তা হবে ইহুদীরাষ্ট্রের জন্য মৃত্যুঘণ্টা।তারা যেকোনো সময় তাদের হৃৎপণ্ডের এই বাড়তি অংশ উপড়ে ফেলবে।

আন্তর্জাতিক যায়নবাদের উৎপত্তি

১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে সুইজারল্যান্ডের পুল নগরীতে এই

সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল থিয়ডর হায়েল।তার সাথে আবার ইউরোপের উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল।তা সত্ত্বেও অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও ভাদের কাছ থেকে তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি।তবে তার সাধ্য সাধনা সফলতার মুখ দেখতে পায় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের মূলমন্ত্র ইহুদীবাদী শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে।১৯১৭ সালে বেলফোর চুক্তির কল্যাণে ফিলিস্তিন ইহুদীদের হাতে ন্যস্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এদিকে আরবদেরকেও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়।অতঃপর সাইকস পিকো চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে করদ রাজ্য হিসেবে নিজেদের মধ্যে আরব অঞ্চলগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মে ১৯১৬ তে।এই চুক্তিতে ফিলিস্তিনকে একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।অতঃপর ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটেন সান রিমো চুক্তির বলে ফিলিস্তিনকে নিজের কাছেই কুক্ষিগত করে রেখে দেয়।১৯২২ সালের জুলাইতে তৎকালীন জাতিপুঞ্জ ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনে তার বেলফোর প্রতিশ্রুতি পালন করার অনুমতি দেয়।অবশ্য ব্রিটেন এর বহু আগেই ফিলিস্তিন ইহুদীদের জন্য উন্মুক্ত করে ফেলেছিল।ইহুদীদের এই অভিবাসন ঢেউ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত জারি থাকে।১৯১৭ সালে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫ হাজার সেখানে ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের সংখ্যা ৬ লক্ষ্য ৪৬ হাজারে পৌঁছে।অর্থাৎ ১৯১৭ সালে যেখানে ইহুদীদের শতকরা হার ছিল মাত্র ৮% সেখানে ১৯৪৭ সালে তাদের হার ৩১% হয়ে যায়।ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সেই অনুপাতে ভূমি অধিগ্রহণ করতেও সহায়তা করে।এতে করে যেখানে মাত্র ২ শতাংশ জমির মালিকানা তাদের ছিল সেখানে ১৯৪৭ সালে তা ৬.৭% এ গিয়ে ঠেকে।তারা এই সব জমিজমা হয়তো ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিনে নেয় নয়তো অফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে।তবে আর্থিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা এই ত্রিশ বছর তাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকে।তাই ১৯৪৭ সালেও দেখা যায় তারাই ছিল সংখ্যাগুরু জাতি অর্থাৎ ৬৯% আর ৯৩.৩% শতাংশ জমি তাদের দখলেই ছিল।তবে সংখ্যায় কম হলেও ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় ইতিমধ্যে ইহুদীরা তাদের সকল অর্থনৈতিক,শিক্ষা, সাংস্কৃতিক,সামাজিক এবং সামরিক স্থাপনাগুলো তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। দেখা যায় ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রায় ২৯২টি বসতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।তাছাড়া, হাগানা, আরগুন এবং স্ত্রেন নামে কয়েকটি সামরিক ইউনিটও

তারা তৈরি করে ফেলে।এসব ইউনিটের সৈন্য সংখ্যা অচিরেই সত্তর হাজার ছাড়িয়ে যায়। এতসব প্রস্তুতির পর এখন তারা অপেক্ষায় থাকে ইহুদীরাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়ার।

আর্থিক ও সামরিক শক্তির বিবেচনায় ফিলিস্তিনিরা ইহুদীদের তুলনায় অসহায় হলেও ব্রিটিশ দখলদারিত্ব অস্বীকার করে আর তাদের ইহুদী পৃষ্ঠপোষকতাও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সংগঠন।তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মুফতী আমীন আল-হুসাইনি (১৮৯৩-১৯৭৪)। তারা বিভিন্নভাবে গণমত তৈরি করেন, রাজনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিদের সচেতনতা তৈরি করেন এবং তাদেরকে বিপ্লবের প্রতিও আহ্বান জানান।এতে করে মাঝে মধ্যেই ফিলিস্তিনে বিভিন্ন আন্দোলন আর বিপ্লবের প্রকোপ দেখা দেয় যা আজও আমরা চলমান দেখতে পাই। ধারাবাহিকভাবে জেরুজালেম, হাইফা এবং বারাকে **১৯২০, ১৯২১** এবং **১৯২৯** সালে বিদ্রোহ দেখা দেয়।**১৯৩৩** সালে মুহাম্মদ ইজ্জুদ্দীন আল- আসসামের নেতৃত্বে (১৮৮২-১৯৩৫) হারকাতুল জিহাদ আত্মপ্রকাশ করে।তারপর একে একে সবুজ মুষ্ঠী গ্যাং আর আল-জিহাদুল মুকাদ্দাস নামের জিহাদি দলের আত্মপ্রকাশ দেখা যায়।এতসব আন্দোলন আর জিহাদের তোড়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের অবস্থা বেসামাল হয়ে যায়।বিশেষ করে **১৯৩৬** থেকে **১৯৩৯** সাল পর্যন্ত সময়টাতে যখন বৃহত্তর বিপ্লব দেখা দেয়। মুজাহিদদের দাবির মুখে ব্রিটিশরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়।তারা **১৯৩৯** সালের মে মাসে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় দশ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হবে না এবং ইহুদীরা আর কোনো ফিলিস্তিনি জমি কিনতে পারবে না।আর আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই ইহুদী অভিবাসন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।তবে **১৯৪৫** সালে ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে বেমালুম সরে আসে।এবার ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে নতুন পরাশক্তি আমেরিকা।

১৯৪৭ সালের মে মাসে জাতিসংঘ ঘোষণা দেয় ফিলিস্তিনকে তিন ভাগ করা হবে।এর এক ৫৪% পাবে ইহুদীরা, ৪৫% আরবরা আর ১% আন্তর্জাতিক অঞ্চল হিসেবে থেকে যাবে।তবে এই ঘোষণা দেওয়া হয় জাতিসংঘের সাধারণ সভায় যা মানা আবশ্যক কিছু নয়।এ ধরনের কিছু বাধ্যতামূলক করতে হলে জাতিসংঘের ঘোষণা আকারে তা প্রকাশ করতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো এ ধরনের ঘোষণা জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্যের সাথেও সাংঘর্ষিক।একটি দেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে তার জনগণ, তাও স্বেচ্ছায়।আর এই ফিলিস্তিনের আদি জনগণ হচ্ছে ফিলিস্তিনিরা।অথচ এই সিদ্ধান্তের আগে সাধারণ সভায় তাদের মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি।বরঞ্চ,তারা চরম অবিচারের আশ্রয় নিয়ে অভিবাসী ইহুদীদের উত্তম ও অধিক ভূখণ্ড বরাদ্দ দেয়।

ছিনতাই করা রাষ্ট্রের ঘোষণা

১৯৪৮ সালের ১৪ মে সন্ধ্যায় ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়।আরব রাষ্ট্রগুলো এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সহজেই তাদেরকে হারিয়ে দেওয়া হয়।আরবরা ছিল রণকৌশলে অনেক পিছিয়ে।তাছাড়া কয়েকটি রাষ্ট্র একযোগে আক্রমণ করার যে সমন্বয়ের দরকার তারও বেজায় অভাব ছিল।এই যুদ্ধে জিতে গিয়ে ইহুদীরা ৭৭% ভূমির মালিক হয়ে যায়।অধিকৃত এলাকায় বসবাসকারীদের অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের দেওয়া হয়।তারা সংখ্যায় ছিল ৮ লক্ষের মতো। এদিকে নতুন ৯ লক্ষ ২৫ হাজার ইহুদীদের এখানে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়।৫৮৫টির মধ্যে ৪৭৮টি ফিলিস্তিনি গ্রাম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।সাথে সাথে তারা ৩৪টি গণহত্যা চালায়।বাকি যা ছিল তার মধ্য থেকে জর্ডান পশ্চিম তীরকে নিজের অধীনে নিয়ে আসে আর গাজাকে নিয়ে যায় মিশর। এদিকে জাতিসংঘ ইসরাঈলকে এই শর্তে স্বীকৃতি দেয় যে তারা বিতাড়িত সকল ফিলিস্তিনিকে নিজেদের এলাকায় ফেরার অনুমতি দিবে।কিন্তু স্বীকৃতি পেয়ে ইসরাঈল তা আর কখনো করেনি।

ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ আর শরণার্থী সমস্যা

ইহুদীরা ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই ইসলামী ও আরবী সব ধরনের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিতে তৎপর হয়।১৯৪৮ সালে যে সকল ভূমি তারা দখল করে তার ৯৮% শতাংশ তারা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ওয়াকফকৃত সম্পদও রেহাই পায়নি। সেখানে তারা ৭৫৬টি শহর ও বসতি গড়ে তোলে।১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পুনরায় সম্মিলিত আরববাহিনীকে পরাজিত করে পশ্চিম তীরের ৬০% ভূ-সম্পন বাজেয়াপ্ত করে নেয়।আর সেখানে নতুন করে ১৯২টি ইহুদী বসতি গড়ে তোলে।অন্যদিকে গাজার ৩০% ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেখানে ১৪টি ইহুদী বসতি গড়ে তোলে।তদুপরি তারা ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ইহুদী অভিবাসীদের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।ফলশ্রুতিতে সেখানে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮ লক্ষ ইহুদী বহির্বিশ্ব থেকে এসে নতুন বসতি গড়ে তোলে।এতে করে ইহুদীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষে উন্নিত হয়।

একসময় যায়নবাদীরা খোদ জেরুজালেমের দিকে নজর দেয়।এর ৮৬% তারা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।এখানেও তারা বিভিন্নভাবে ইহুদী অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে থাকে।ফলে ২০০০ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় খোদ বাইতুল মাকদিসে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৪.৫ লক্ষ আর আদি ফিলিস্তিনিদের মাত্র ২ লক্ষ।

জেরুজালেমের পূর্ব অংশ যেখানে মসজিদুল আকসা অবস্থিত সেখানে তারা এক বিশাল প্রাচীর তুলে দেয়।এই দেয়ালের ভেতর তারা ইহুদী বসতি গড়ে তোলে। এই দেয়াল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল আরবদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা। একসময় তারা ঘোষণা দিয়ে বসে জেরুজালেম তাদের চিরস্থায়ী রাজধানী। ভেতরে ভেতরে তারা মসজিদুল আকসা দখল করারও পাঁয়তারা

করতে থাকে।এই মসজিদের পূর্বের দেয়াল তারা দখল করে নেয়।এর সাথে সাথে তারা পশ্চিম দেয়ালেরও কিছু অংশ নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসে।মসজিদের নিচে তারা বিশ বারের মতো খননকার্য পরিচালনা করে। ফলে এখন সেখানে মোট চারটি সুড়ংয়ের সৃষ্টি হয়।এই সকল খনন ও সুড়ংয়ের কারণে যেকোনো সময় মসজিদুল আকসা ধসে পড়তে পারে।এসব কিছুর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য একটাই, এখানে ইহুদী-মন্দির তৈরি করা।১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তারা মসজিদুল আকসার উপর ১১২ বার হামলা চালায়। ১৯৯৩ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার পরও তারা ১২টি আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৯৬৯ সালে মসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা সবচাইতে ভয়াবহ কাণ্ডটি ঘটায়।

এদিকে বিতাড়িত হওয়ার পরও ফিলিস্তিনি শরণার্থীরা তাদের আদিভূমির অধিকার আদায়ের আন্দোলন জারি রাখে।তাদের জন্য ২৪৩টি শরণার্থীশিবির নির্মাণ করার পরও তারা তাদের দাবি ছাড়েনি।এ পর্যন্ত জাতিসংঘ না হলেও ১১১টি সিদ্ধান্ত দেয় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের আদিভূমিতে ফিরে যাওয়ার।তবে সবগুলোই ইসরাঈল ঠান্ডা মাথায় প্রত্যাখ্যান করে যায়।এ বিষয়ে পরাশক্তিগুলোর নির্লিপ্তিতাও অনেকটা দায়ী।১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লক্ষ। এর পাশাপাশি রয়েছে আরো ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনি যারা পশ্চিম তীর আর গাজায় অপেক্ষায় রয়েছে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া আদিভূমিতে ফিরে যেতে।এ সব কারণে বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে জটিল শরণার্থী সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ফিলিস্তিন শরণার্থী সমস্যা।

১৯৪৯ সাল থেকে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনি শরণার্থী সমস্যা নিয়ে খেলা করে আসছে। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ সভায় কয়েকবার পাশ হয় ফিলিস্তিনিদের আদিভূমিতে ফিরে যাওয়ার আর নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাদের ছিনিয়ে নেওয়া আদিভূমি উদ্ধার করার শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সকল আন্দোলনই বৈধ।ইসরাঈলের নিন্দা জানানো হয় বর্ণবাদী আচরণের কারণে। আরো নিন্দা জানানো হয় ফিলিস্তিনিদের তাদের আদিভূমিতে ফিরতে বাধা দেওয়ার কারণে।তবে বারংবার ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের এ সকল পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় আমেরিকার ভেটোর কারণে।কোনো সিদ্ধান্তই আর পাশ হয় না।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সালের সময়টাকে ধরা হয় ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগ্রামের সোনালি যুগ।তবে জর্ডান যখন তার মাটি থেকে এসব না করে।কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে নিষেধ করে দেয় তখন তারা একটি ধাক্কা খায়।এরপর তারা লেবানন থেকে চালাতে থাকে।তবে লেবানন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে (১৯৭৫-১৯৯০) তারা বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়।তাদের অনেক নেতা গুপ্তহত্যার শিকার হয়।ইসরাঈলও লেবাননের উপর ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে হাজারো আক্রমণ

চালায়।১৯৭৮ সালে ইসরাঈল দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ করে সেখানে অনেক ফিলিস্তিনি হত্যা করে। তারপর সেখানে লেবাননি খ্রিষ্টানদের সহায়তায় তাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বিরাট এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।১৯৮২ সালে তারা চূড়ান্ত আক্রমণ করলে দক্ষিণ লেবানন থেকে তাদের ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।এতে করে ইসরাঈলের সীমান্ত ঘেঁষে ফিলিস্তিনিদের গেরিলা হামলা চালাবার মতো আর কোনো দেবনা।নমনীয় এ ধরনের ঘাঁটি থাকল না। চিরতরে তাদের মুখের উপর ইসরাঈলী সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো।

তবে ফিলিস্তিনিরা সবচাইতে বেশি ভোগান্তির শিকার হয় খোদ আরব জাতভাইদের হাতে। এমন অনেক দেশ আছে যারা আরব হয়েও ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।তারাই হতে চায় এসব সংগঠনের মূল নিয়ন্তা।এতে করে ফিলিস্তিনি বিপ্লব অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে মিশর ও সিরিয়ার বাহিনী ইসরাঈলি বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হলে আরবরা তাদের মনোবল কিছুটা ফিরে পায়।তবে এর নেতিবাচক প্রভাব হলো একমাত্র পিএলওকে প্রভাবশালী আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করা সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।চূড়ান্ত ধাক্কাটি খায় যখন মিশর ক্যাম্প ডেভিডে ইসরাঈলের সাথে শান্তিচুক্তি করে বসে।মিশরের দেখাদেখি অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোও ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয়।১৯৭৮ সালে সই করা এই চুক্তির কারণে আরবের সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র আরব-ইসরাঈল দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।এরপর দেখা দেয় ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮)।এতে করে ইরাকের মতো বড় সমর্থকের মনোযোগও তারা হারিয়ে ফেলে।তদুপরি তেলের দাম কমে যাওয়াতে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো আগের মতো অর্থিক সহযোগিতা করা থেকে পিছিয়ে যায়। তারপর ইরাক যখন কুয়েত দখল করে (১৯৯০) তখন সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।এর প্রভাবে সমগ্র আরব ও মুসলিমবিশ্বে বিশাল অনৈক্যের ফাটল দেখা দেয়।সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলেও তার প্রভাবে ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।এহেন পরিস্থিতিতে পিএলওর শান্তির পথ বেছে নিতে হয়।তারা চিন্তা করে যেহেতু ধরতে গেলে তারাই একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি তাহলে তারা যদি কিছুটা ছাড়ও দেয় তবুও কারো আপত্তি তেমন একটা থাকবে না। নমনীয় এ ধরনের নীতির ফলে তারা তাদের নেতৃত্বও টিকিয়ে রাখতে পারবে।

১৯৮০ সালে ইসরাঈলী সংসদ যা কেনিসেট নামে পরিচিত তা জেরুজালেমের অন্তর্ভুক্তিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে তাদের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেয়।

ইহুদীকরণের বিভিন্ন ধাপ

১৯৬৭ সালে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইহুদী কর্তৃপক্ষ জেরুজালেম আরব পরিষদ ভেঙে দেয়।আরব আপিল কোর্ট রামাল্লাহ শহরে পাঠিয়ে দেয়। জেরুজালেমের মুসলমানদের জন্য নতুন আইন জারি করে এ ধরনের অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।অপরদিকে হাদীদের জন্য নতুন করে টেলিফোন লাইন আর পানির পাইপ সংযোজন করা হয়।অনেক সরকারি দপ্তর ও অধিদপ্তর জেরুজালেমে নিয়ে আসে।আরবদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও ব্যাপক ইহুদীকরণের আওতায় আনা হয়। এক পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও কর অঞ্চলের বিবেচনায় পুরো শহরটাকে অন্যান্য আরব শহরগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

১৩৭৮ হিজরীতে অর্থাৎ সেই ১৯৬৭ সালে ইহুদীরা পুরাতন জেরুজালেমের মাগারিবা মহল্লা এবং শরফ এলাকা আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।তার পাশাপাশি ১১৬ একর ওয়াকফকৃত জমি দখল করে নেয়। হিসেব করলে দেখা যায় এই বিশাল ভূসম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৫৯৫টি বিভিন্ন ধরনের সম্পদ এবং দু'টি বড় মসজিদ।এই ভূসম্পদ ছিল পুরাতন এলাকার প্রায় ১০%।

১৯৬৯ সালে বৃহত্তর জেরুজালেমের বিষদ পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য ১৫টি নতুন ইহুদী বসতি গড়ে তোলা হয় আর এটা ছিল জেরুজালেমকে ঘিরে তাদের ইহুদী বসতির দ্বিতীয় বেল্ট।

১৯৭৪ সালে পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপ পেশ করা হয়।আর তা প্রবর্তন করে ড. রাল্ফ বেনকার।তবে এবারের পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক।তিনি নিম্নের পয়েন্টগুলোর উপর জোর দেন:

১) ইহুদীদের অধীনে একক ও অবিভক্ত শহর হিসেবে থাকবে জেরুজালেম।

২) জেরুজালেমকে মোট ১৮টি সেক্টরে বিভক্ত করা হবে। এর থাকবে ৫৫টি পৌরসভা। আর জেরুজালেম হবে কেন্দ্রীয় পৌরসভা। প্রতিটি পৌরসভায় মোট ৫৫ জন সদস্য থাকবে যার ৩৮ জনকে অবশ্যই ইহুদী হতে হবে।

৩) প্রতিটি মহল্লায় ইহুদীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

৪) প্রতিটি প্রার্থনালয়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৫) আরবদের জনসংখ্যা হতে হবে নিয়ন্ত্রিত। আর তা কখনো ২৫% ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

৬) ১৯৭৫ জেরুজালেমের পর সীমানাবৃদ্ধির জন্য যে সকল এলাকা দখলে নিতে হবে তা হল, উত্তরে রামাল্লাহ, পূর্বে আল বেরা থেকে আবু দীস পর্যন্ত।দক্ষিণে বাইত লাহম পর্যন্ত আর পশ্চিমে লাতরুন পর্যন্ত।

সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা আশেপাশের ৬০টি আরব গ্রাম দখল করে নেয় যা ছিল পশ্চিম তীরের ৩০%। তারপর সেখানে তারা ১৫টি ইহুদী বসতি গড়ে তোলে। এটা ছিল জেরুজালেমের পাশে তাদের তৃতীয় ইহুদী বসতি বেল্ট।

১৯৮১ সাল থেকে তারা পুরাতন আরব জেরুজালেমে ৯টি ইহুদী বসতি নির্মাণ করতে শুরু করে।আরব যে মহল্লাগুলো তারা দখল করে সেগুলো হচ্ছে,রামাত স্কুল,মালূত দাফনা,সানদ-হাদরিয়া, জাবআত হামফাতার,নবী ইয়াকুব,তাল্লা ফারানসিয়া,জামেয়া আরাবিয়া,তালবুয়ূত এবং আতরূত।

বৃহত্তর জেরুজালেম পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়,২০০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা এই শহরে দশ লক্ষে উন্নিত করতে হবে।তবে এর ৭৫% শতাংশ হবে ইহুদী।তারমানে আরবদের সংখ্যা আড়াই লাখের বেশি হতে পারবে না।আর এই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আরবকে জেরুজালেম ছাড়া করতে হবে।

ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রাম

সুদীর্ঘ এক শতাব্দীরও অধিককাল যাবত ফিলিস্তিনীরা তাদের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত। তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৮৭৫ সনে আরব দেশসমূহের যে সংস্থা গঠিত হয় ফিলিস্তিনের জনগণও তাতে অংশগ্রহণ করে।১৮৮২ সনে মিসরে আরবী পাশার নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় ফিলিস্তিনী জনগণও তাতে অনুপ্রাণিত হয়।১৯১৩ সনে স্বাধীনতার দাবিতে আরব দেশসমূহের যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফিলিস্তিনীরাও তাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে।১৯১৪ সনে আরও ব্যাপকভাবে আর একটি আরব জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীনতার আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে।এর ফলে তুর্কী সরকার বহু আরব নেতাকে গ্রেপ্তার করেন এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন ফিলিস্তিনী নেতা।

অনুরূপভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল করার পর তাদের বিরুদ্ধেও ফিলিস্তিনীরা আন্দোলন চালিয়ে যায়।তারা প্রতিটি শহর ও গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলেন।এতে

মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ফিলিস্তিনের মাটিতে পা দিয়েই এর জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত শুরু করে।তারা ইহুদীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয় এবং ইউরোপ থেকে ইহূদী আমদানি করে তাদের দল ভারী করতে থাকে।এর ফলে ফিলিস্তিনী খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।তারা ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি জাতীয় সম্মেলন আহবান করে।এতে ২৭টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৯২০ সালে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।কোনো সংগঠন সশস্ত্র সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা বেছে নেয়।ফিলিস্তিনে বিদেশী ইহূদী আমদানি এবং তাদেরকে আরবদের বিরুদ্ধে উড়িয়ে দেওয়াই ফিলিস্তিনীদের ক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল।

১৯১৩ সালেই ফিলিস্তিনীদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এর নীতি ছিল সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা।১৯১৯ সালে ফিলিস্তিন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।পরে আরও দু'একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। সবারই লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা উদ্ধার।১৯২০ সনে ফিলিস্তিনের সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংস্থা সম্মিলিতভাবে জেরুজালেমে একটি জাতীয় সম্মেলন আহবান করে।এই সম্মেলনে 'ফিলিস্তিনী জাতীয় কংগ্রেস' নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।এই কংগ্রেস ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং একটি প্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট গঠনের দাবি জানায়।১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে এ সংগঠনের সভাপতি ফিলিস্তিনের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন।

১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দেশের স্বাধীনতার দাবিতে ফিলিস্তিনী ছাত্র সংস্থার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিনী সাংবাদিক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ফিলিস্তিনে আরবী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল আট।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ফিলিস্তিনী মহিলা কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এতে মহিলা সংস্থার তিনশো প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিলিস্তিনী যুব কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর এবং পল্লী অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৫ সালে প্রথম ফিলিস্তিন জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।এর ফলে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংস্থাসমূহ গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।১৯৩০ সালে প্রথম জাতীয় শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের ম্যান্ডেটরী শাসনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনী শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে ইহূদীদের লেলিয়ে দিলে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য শ্রমিকরা নিজেরাই সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করে।ফিলিস্তিনী কৃষকরাও এ সময় সংগঠিত হয় এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে বহু ফিলিস্তিনী গ্রেফতার হয় এবং কয়েকটি সংস্থা বে- আইনী ঘোষিত হয়।তথাপি ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন ও সংস্থাসমূহ ছাড়াও ফিলিস্তিনে ৭টি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে।দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে দ্বিমুখী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়।একদিকে ইংরেজ শাসক অপরদিকে বহিরাগত আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদী হামলা।সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা বিপুল সংখ্যক বহিরাগত ইহুদী আমদানি ও তাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করতে থাকে।এভাবে দিনের পর দিন ফিলিস্তিনীদের বিপদ আরও ঘনীভূত হতে থাকে।এ সময় সংগ্রামরত ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করার জন্য 'আরব উচ্চতর কমিটি' গঠিত হয়।ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান 'ফিলিস্তিন জাতীয় কংগ্রেস'-ই এ কমিটি গঠন করে।
স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা এবং উচ্চ পর্যায়ের আলাপ-আলোচনার কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এ কমিটির উপর।কমিটি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং একটি প্রতিনিধিত্বশীল আইন পরিষদ বা পার্লামেন্ট গঠনের দাবি জানায়।কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উহা প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটেনের 'হাউজ অব কমন্স'ও ১৯৩৫ সনের মার্চ মাসে ফিলিস্তিনের এই দাবি গ্রাহ্য করে এবং ফিলিস্তিনে অবাধে ইহুদী আমদানির পক্ষে রায় দেয়।

এর ফলে ফিলিস্তিনীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ফিলিস্তিনে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটে।কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীর সাহায্যে কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে।এ সময় সৈন্যদের গুলিবর্ষণে ৫০৩২ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয় এবং ৮৯৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বিদ্রোহের অপরাধে ইংরেজ সৈন্যরা পাঁচ হাজার ঘর-বাড়ি যধ্বংস করে দেয়। ম্যান্ডেটরী সরকার অস্ত্রের বলে এ গণঅভ্যুত্থান দমন করতে সক্ষম হলেও এতে তাঁরা কিছুটা বিচলিত হন এবং ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা প্রদানে ও ইহূদী আমদানি বন্ধ করতে স্বীকৃত হন।

১৯৩৯ সালে ফিলিস্তিনীরা যখন স্বাধীনতা লাভের আশায় মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল,ঠিক তেমনি এক মুহূর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং ঐ অজুহাতে ব্রিটেন তার ওয়াদা ভঙ্গ করে।ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের ইয়াহূদী নির্যাতনের ফলে হাজার হাজার ইহূদী উদ্বাস্তু

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং 'জায়নবাদী' আন্দোলন তীব্রতর হয়।ঐ সমস্যার সমাধানকল্পে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।ফিলিস্তিনের উপর ইহূদীদের ঐতিহাসিক দাবির কথা বিবেচনা করে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের 'গ্লোবাল-পলিটিক্সের' ক্ষেত্রে কৌশলগত নানা সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশী হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সেখানে একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজ সৈন্য ও ইহূদী সন্ত্রাসবাদীরা ফিলিস্তিনীদের উপর নতুনভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু করে।তখন থেকে ইংরেজ সৈন্যরা প্রকাশ্যেই ইহূদীদের পক্ষাবলম্বন করতে থাকে।তারা তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সমর্থন দেওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে।সাথে সাথে ইউরোপ ও আমেরিকার ইহূদীবাদী সংস্থাসমূহ থেকে তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্যও আসতে থাকে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও ফিলিস্তিনীরা মার খেতে থাকে।অবশ্য এ সময় প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।ফিলিস্তিনী যুবকরা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে।এই সময় ব্রিটিশের দ্বিমুখী নীতির ফলে ইহূদীদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তারাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কিছু সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হয়।এর ফলে ব্রিটিশ সরকার উভয়সংকটে পড়ে।তাই অবশেষে ১৯৪৬ সনে ব্রিটেন লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।ঐ বৈঠকে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনী ও অন্যান্য আরব দেশের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক ইহূদীবাদী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দও অংশগ্রহণ করে।ব্রিটেন ও ইহূদী প্রতিনিধিরা ফিলিস্তিন বিভাগের প্রস্তাব পেশ করে।কিন্তু আরব প্রতিনিধিবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করেন।ফলে ঐ বৈঠক ব্যর্থ হয়।এভাবে ফিলিস্তিন সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় ব্রিটেন উহা জাতিসংঘে উপস্থাপন করে এবং সেখানে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রভাবে ১৯৪৭ সনের ২১ নভেম্বর ফিলিস্তিন বিভাগের সুপারিশ করা হয়।কিন্তু ফিলিস্তিনীরা জাতিসংঘের বিভাগ প্রস্তাব এবং ১৯৪৮ সনের ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। বর্তমানে ফিলিস্তিনীরা তাদের মাতৃভূমি উদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা

প্যালেস্টাইনের বুকে ইসরাঈল নামক একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আরব ও ইহূদীবাদের দ্বন্দ্বে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী মুসলিম তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় নেয়।বলতে গেলে গোটা ফিলিস্তিনীরাই একটা উদ্বাস্তু জাতিতে পরিণত হয়। স্বদেশহারা ফিলিস্তিনীদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৩ সনে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে 'আল-ফাতাহ' নামক মুক্তি সংস্থা গঠিত হয়। জবরদখলকারী ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে দেখতে দেখতে ফিলিস্তিনীদের মোট ৮টি গেরিলা সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৬৪ সালের ২৮ মে জেরুজালেমে ফিলিস্তিন জাতীয় কংগ্রেসের যে সম্মেলন আহূত হয় তাতে ৩৮৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।তন্মধ্যে ২৭২ জন জর্ডান থেকে এবং বাকি ১৪৩ জন সিরিয়া, লেবানন, গাজা অঞ্চল, ইরান ও উপসাগরীয় দেশসমূহ হতে এসেছিলেন। তাঁদের সবাই ছিলেন বিভিন্ন ফিলিস্তিনী কমিটিসমূহের প্রতিনিধি।ঐ সম্মেলনেই ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ৮টি ফিলিস্তিনী গেরিলা সংগঠনের সমন্বয়ে 'প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা' (পি. এল. ও.) গঠিত হয়।সংস্থার গঠনতন্ত্রের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে- 'প্রত্যেক ফিলিস্তিনীই এই সংস্থার স্বাভাবিক সদস্য।' এভাবে এ সংস্থাকে ব্যাপক ভিত্তিক ও গণমুখী করা হয়েছে।এ ছাড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে-"এই সংস্থা ফিলিস্তিনীদের মাতৃভূমি উদ্ধারের লক্ষ্যে আরব দুনিয়া ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের সকল ভূমিকা পালন করবে।"

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পি. এল. ও.)-এর মোট আটটি শাখা রয়েছে।এ আটটি শাখা বা গ্রুপের প্রতিনিধিদেরকে নিয়েই পি. এল. ও. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত।পি. এল. ও.-এর মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রুপ হচ্ছে আল-ফাতাহ,যার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসির আরাফাত।আটটি গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকটিই পি. এল. ও.-এর সদস্যভুক্ত।মোট ১৬ জন সদস্য নিয়ে পি.এল.ও-এর কার্যনির্বাহী কমিটি।সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসাবে আল-ফাতাহর তিনজন সদস্য রয়েছেন। অপর ৭টি সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া বাকি ৬ জন সদস্য নেয়া হয়েছে অন্যান্য বিশিষ্ট ফিলিস্তিনী নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে।কার্যনির্বাহী কমিটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।ইয়াসির আরাফাত এ কমিটির চেয়ারম্যান।ইয়াসির আরাফাতের বর্তমান (১৯৯৫) বয়স ৬৬ বছর।বৃহত্তম ফিলিস্তিনী গেরিলা সংগঠন 'আল-ফাতাহ'র সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার আগে ইয়াসির আরাফাত মিশরীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন।

পি.এল.ও.-এর অন্যতম একটা অঙ্গসংগঠন 'পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' (পি.এফ.এল.পি.) গঠিত হয় ১৯৬৭ সনে।এর প্রতিষ্ঠাতা জর্জ হাবাশ। তিনি একজন প্যালেস্টাইনী খ্রিষ্টান ও কট্টর মাক্সিস্ট।১৯৫০ সনে তিনি আরব ন্যাশনাল মুভমেন্ট নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। দক্ষিণ ইয়েমেন,সিরিয়া,প্যালেস্টাইন ও জর্ডানে এর শাখা গঠন করেন।দক্ষিণ ইয়েমেনে হাবাশের অনুসারী এই সংগঠনটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে।সেখানে তাঁর অনুসারীরাই দীর্ঘকাল যাবত ক্ষমতায় আসীন।আরব ন্যাশনাল মুভমেন্টের প্যালেস্টাইন শাখাটি সেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে এবং তা পরে ১৯৬৭ সালে পি. এফ. এল. পি নাম ধারণ করে।তাঁর এ গ্রুপটি আল-ফাতাহর তুলনায় ক্ষুদ্র।তবে এরা সশস্ত্র লড়াই এবং ইসরাঈলের অভ্যন্তরে সফল হামলা,কমান্ডো তৎপরতা ও বিমান ছিনতাই-এর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭৩ সনে তাঁর এ গ্রুপটি ইসরাঈলের তেলআবিব বিমান বন্দরে এক সশস্ত্র দুঃসাহসিক অপারেশন চালায়।বর্তমানে (১৯৯৫) ৬৯ বছর বয়স্ক হাবাশ কোন অবস্থাতেই ইসরাঈলের সাথে শান্তিচুক্তি

বা কোনরকম সমঝোতায় আসার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মতে একমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।পি. এল. ও.- এর জেনেভা সম্মেলনে যোগদানে প্রস্তুতি এবং ইসরাঈলের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের অভিযোগে হাবাশ পি. এল. ও. ত্যাগ করেন।পরে পি.এল.ও ক্যাম্পডেভিড যুক্তি প্রত্যাখ্যান করলে ১৯৮০ সালে হাবাশ আবার পি.এল.ও-তে ফিরে আসেন।জর্জ হাবাশের নেতৃত্বাধীন পি.এফ.এল.পি.-এর সদস্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার।পি. এল. ও.-এর অঙ্গ দলগুলোর মধ্যে আল-ফাতাহর পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল এটি।
অন্যান্য আন্তর্জাতিক চরমপন্থী দলের সাথে হাবাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।তিনি মনে করেন যে,মধ্যপন্থী আরব শাসকদের উৎখাত করা দরকার এবং শুধু ইসরাঈলই নয়,ইসরাঈলের মিত্র দেশগুলোর অভ্যন্তরে যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো উচিত।

১৯৮২ সনের লেবানন যুদ্ধের পর হাবাশ তাঁর দলবল নিয়ে সিরিয়াতে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন।সিরিয়া এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে এখন যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাদের অনেকেই হাবাশের পুরনো বন্ধু।কাজেই তাদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

পি.এল.ও-এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে আরও যেসব দল আছে তন্মধ্যে 'Democratic Popular Front for Liberation of Palestine.' (D.P.F.L.P) এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নায়েফ হাওয়াতমেহ। এ দলটি মূলত হাবাশের দল থেকে বেরিয়ে আসা একটি উপদল।এই দলটি কট্টর মার্কসবাদে বিশ্বাসী।১৯৬৯ সালে হাবাশকে 'প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী' বলে অভিযুক্ত করে নায়েফ হাওয়াতমেহ্ হাবাশের দল ত্যাগ করেন।তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা কয়েকশো।এ দলটি পি. এল. ও.-এর অন্য অঙ্গ-দলগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি সোভিয়েতপন্থী।এরা উড়োজাহাজ হাইজ্যাক করার মত সব কৌশল ত্যাগ করে অধিকৃত এলাকার মধ্যে সংগ্রাম জোরদার করার পক্ষে।১৯৭৪ সালে ইসরাঈল অধিকৃত এলাকার মাওলাত-এ এই দল এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। লেবানন ত্যাগের (১৯৮২) পর চরমপন্থী আরব রাষ্টগুলোকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন।

পি. এল. ও.-এর আর একটি অঙ্গদল 'Popular Front for the Liberation of Palestine General Command.' (P.F.L.P.-G.C.) এটাও হাবাশের দল থেকে বেরিয়ে আসা একটা গ্রুপ।সিরীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার ক্যাপ্টেন আহমদ জাব্রিল হলেন এ দলের নেতা। জাব্রিলও একজন মার্ক্সিস্ট।তিনি হাবাশের দলের সামরিক শাখার সংগঠক ছিলেন। তিনি হাবাশের দল থেকে ১৯৬৮ সনে বেরিয়ে আসেন।কারণ,তাঁর মতে হাবাশ প্রকৃত বামপন্থী নন।এ দলটিও বেশ কয়েকটি দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়েছে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে।লিবিয়া ও সিরিয়ার সাথে জাব্রিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে।

সায়িকা নামে আরেকটি সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন রয়েছে যাকে পি. এল. ও.-এর সিরিয়ান ফ্রাকশন বলে মনে করা হয়। আরব লিবারেশন ফ্রন্ট নামে পি এল ও-এর সদস্যভুক্ত আরেকটি গ্রুপ রয়েছে। এটি ইরাকী ফ্রাকশন।এছাড়া পি.এল.ও.- এর অভ্যন্তরে আরও ক্ষুদ্র দু'টি গ্রুপ রয়েছে।আল-ফাতাহ্ এবং পি.এফ.এল.পি.-এর তুলনায় এগুলো আরও ছোট ছোট গ্রুপ।

ফিলিস্তিনে হামাস

ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা-পিএলও যে স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৮৭ সালে হামাস নামে নতুন একটি দলের উৎপত্তি হয় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়। হামাস শব্দের আক্ষরিক তরজমা- 'আশা' বা 'উদ্দীপনা'। দলটির পুরো নাম হরকত মুকাওয়ামাতুল ইসলামিয়া)حركة المقاومة الإسلامية(।প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ আহমদ হাসান ইয়াসিন (১৯৩৭-২২ মার্চ ২০০৪)।শুরুতে অতো আলোচিত ছিল না দলটি।ফাতাহ'র ব্যর্থতার সূত্রকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তারা।

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

শায়েখ ইয়াসিন কিছু যৌক্তিক কারণে পিএলও'র ওপর ছিলেন বিরক্ত।তিনি এও বুঝতে পারেন, ইসরাইল কখনোই ফিলিস্তিনকে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি দেবে না।১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে যতোগুলো কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল নিষ্ফল। 'আলাপ-আলোচনার' অসারতা বুঝতে পেরে শায়েখ ইয়াসিন জায়নবাদী আগ্রাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ডাক দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার করে একটি কথা বলেন-

"ফিলিস্তিন মুসলমানদের জন্য শেষবিচারের দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং কোনো আরব নেতার অধিকার নেই এর এক টুকরো অংশও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের মানুষদের ভোগ করতে দেবে।"

১৯৮৮ সালে গৃহীত হয় 'হামাস চার্টার' যার লক্ষ্য ছিল-অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো।পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত
শুরুতে ছিলেন আপোষহীন।'৮৮ সাল পর্যন্ত পিএলও ছিল দুর্দান্ত গৌরলা সংগঠন।কিন্তু জাতিসংঘের প্রস্তাবে আরাফাত অস্ত্র পরিত্যাগ করে ইসরাইলের সঙ্গে 'শান্তি' আলোচনায় বসলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।শান্তি আলোচনার নামে ইসরাইল একদিকে সময়ক্ষেপণ করে,অন্যদিকে ফিলিস্তিনি ভূমি দখল ও অবৈধ বসতি স্থাপনের কাজ চালিয়ে যায় দুর্বার গতিতে। আরাফাতের 'শান্তি আলোচনার' ফলাফল, ফিলিস্তিনি জমিতে নতুন নতুন ইহুদি বসতি

নির্মাণ!আজকের ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে ইহুদি বসতি। ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম মৌমাছির চাকের মতো ছেয়ে গেছে ইহুদিতে।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইউরোপীয় ইউনিয়ন,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা,ইসরাইল ও জাপান হামাসকে 'সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।পশ্চিমাদের আবদার, ইসরআইলকে স্বীকৃতি দিতে হবে হামাসের এবং অতীতের কয়েকটি 'শান্তি' চুক্তিও মেনে নিতে হবে তাদের।স্বভাবতই হামাস এটি প্রত্যাখ্যান করেছে।হামাসের প্রতি রয়েছে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক সমর্থন।শুধু কট্টর ইসরাইল বিরোধীই নয় জনহিতকর ও সামাজিক নানা কর্মসূচির সঙ্গেও দলটি সম্পৃক্ত।

হামাসের মূল শাখা তিনটি-রাজনৈতিক শাখা,সমাজকল্যাণমূলক শাখা ও সামরিক শাখা।মজলিশে শূরা হামাসের প্রতিনিধিদের মিলনস্থল,যার মাধ্যমে হামাস সমগ্র ফিলিস্তিনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। হামাসের নীতিনির্ধারণী পরিষদ পনেরো সদস্যের 'পলিটিক্যাল ব্যুরো'।বর্তমানে হামাসকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন খালেদ মাশাল।

নির্বাচনে বিজয়

২০০৪ সালে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সেটি চরম আকার ধারণ করে ২০০৬-এর নির্বাচনের পর।২০০৬-এর জানুয়ারিতে ফিলিস্তিনি সংসদীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে বিস্ময়করভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় হামাস।১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৪টিতে বিজয়ী হয় তারা। 'মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের' প্রবক্তা আমেরিকা,রাশিয়া,অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন একযোগে হামাসের সরকার গঠনের অধিকারকে
অস্বীকার করে।যদিও 'গণতন্ত্রে' ফেরানোর প্রচেষ্টা থেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়-ইরাক,আফগানিস্তান ও আরো কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রকে!কিছুদিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইসরঈলের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের শিকার হয় দলটি।হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারকে পশ্চিমারা কখনো স্বীকৃতি দেয়নি।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবের হস্তক্ষেপে হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।এর প্রেক্ষিতে ওই বছরের মার্চে Palestinian Legislative Council (পিএলসি) গঠিত হয়।ফাতাহ'র প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লপশ্চিম তীরে ফাতাহ ও গাজা হামাস নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই শপথগ্রহণ রামাল্লা (পশ্চিম তীর)

ও গাজায় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও ফাতাহ'র একপেশে সিদ্ধান্তে আবারো শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১৫ জুন গাজায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে হামাস।গাজার জনসাধারণ হামাসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বীরের মতো বরণ করে নেয় তাঁদের।এরপর গাজা থেকে ফাতাহ'র সরকারি আমলারা ফিরে যায় পশ্চিম তীরে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

৩৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একচিলতে গাজায় জনসংখ্যা প্রায় আঠারো লাখ।প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে তেরো হাজার মানুষ।মিসরের সঙ্গে ১১ কিমি. ও ইসরাইলের সঙ্গে ৫২ কিমি. স্থল-সীমান্ত আর একদিকে আছে অবারিত ভূমধ্যসাগর,যা ইসরাঈলি নৌ-বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ।গাজার ১৮ লাখ মানুষের ১০ লাখ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তু।এমন একটি ভূখণ্ডে দশ বছরব্যাপী অবরোধের মধ্যে থেকেও দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করছে হামাস।

ইসরাঈলি বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উঠে এসেছে হামাসের কার্যক্রমের ৯০% সামাজিক,শিক্ষা বিস্তার,সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক এবং এই সামাজিক কাজের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা,মসজিদ স্থাপন,স্কুল ও শিশুশিক্ষায় অর্থায়ন ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা অন্যতম।বার্ষিক ৭০-৯০ মিলিয়ন ডলারের একটি বাজেট দিতে সক্ষম হয় দলটি,যার ৮৫% অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে।প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে তাদের বরাদ্দ ১৫%।

ইসরাঈলি আগ্রাসনে শহীদ ফিলিস্তিনিদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এককালীন ও নিয়মিত অর্থ সহায়তা দেয় হামাস (যার পরিমাণ ৫০০ থেকে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত)।ধ্বংস হওয়া বাড়ি-ঘর, স্কুল বা মসজিদ মেরামত করার জন্য তাদের আছে আলাদা সেল।সরকারের ধর্মমন্ত্রনালয়ের অধীনে 'ফাদেলা' বা 'Virtue Committee' নামে নাগরিক কমিটি আছে,যারা বিভিন্নভাবে জনসাধারণকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহবান জানায়।

শিক্ষাব্যবস্থা

টানা দশ বছরের অবরোধ এবং নানা ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও গাজা উপত্যকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে হামাস। ২০১২ সালের হিসেবে গাজায় শিক্ষার হার ৯৯%।পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও চার লাখ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬৮৩টি স্কুল রয়েছে যার ৩৮৩টি সরকার অর্থাৎ হামাস পরিচালনা

করে।শিশুদের জন্য অসংখ্য নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা,যেখানে শিশুদের একবেলা খাবারও সরবরাহ করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবায় হামাস নিজেকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য অবস্থানে।অব্যাহত অবরোধে খাদ্যের মান কমে যাওয়ায় গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শৈশবকালীন অপুষ্টির হার মারাত্মকহারে বেশি।এছাড়া প্রতিনিয়ত ইসরাঈলি আগ্রাসনে আহত মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই।হামাস পরিচালিত হাসপাতালে কম খরচে বা বিনা খরচে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়।মৃত্যু উপত্যকা গাজায় বর্তমান জন্মহার ৪%।বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও দাতা দেশ থেকে আসা সাহায্য ও আর্থিক অনুদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে দলটি যেখানে ফাতাহ গোষ্ঠী আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্নীতিতে।হামাসের সামাজিক কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা শুধু গাজা উপত্যকায় নয়, বরং ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীর এমনকি আশেপাশের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও সুনাম কুড়াচ্ছে।

মিডিয়া উইং

২০০৬ সালে হামাস চালু করেছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'আল-আকসা টিভি'।হামাস সদস্য ফাতহি হাম্মাদের মিডিয়া হাউজ 'আর-রেবাত কমিউনিকেশন্স'-এর নেতৃত্বে রয়েছে নিজস্ব রেডিও স্টেশন 'ভয়েস অব আল-আকসা' এবং সংবাদ পত্রিকা 'দ্য ম্যাসেজ'। অনলাইন জগতে টুইটার এবং ফেসবুকসহ সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে রয়েছে দলটির সরব উপস্থিতি।লন্ডন থেকে আল-ফাতেহ নামে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের হয় নিয়মিত।

সামরিক শাখা

হামাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইং এর সামরিক শাখা শায়েখ ইজ্জুদ্দীন আল- কাসসাম ব্রিগেড।সংক্ষেপে 'আল-কাসসাম ব্রিগেড'।১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরঈলকে সামরিকভাবে তটস্থ রেখেছে ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম।সীমিত সাধ্যের মধ্যেও নিজস্ব প্রযুক্তি ও অর্থায়নে কাসসাম রকেট দিয়েই জায়নবাদের বিলিয়ন ডলারের আয়রন ডোম অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করছে হামাস। ইসরঈলের প্যাট্রিয়ট মিসাইল এবং এফ-১৬'র মোকাবেলায় কাসসাম ব্রিগেডের ব্যবহার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে স্বল্প মাত্রার আল-বানা, আল-বাতার এবং আল-ইয়াসিন' রকেট।আছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গোলাসহ কিছু হালকা যুদ্ধাস্ত্র।তাঁদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র,'অকুতোভয় ঈমান, দৃঢ়তা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি ভরসা ও ভালবাসা'।

সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরের তলদেশ দিয়ে ইসরাইলে পৌঁছে এক দুঃসাহসিক কমান্ডো অভিযানের চেষ্টা চালিয়েছে হামাস যোদ্ধারা।মুসলিম দেশ হিসেবে সফলভাবে ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তারা,যা তেলআবিবের (ইসরাঈলের রাজধানী) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।স্থলযুদ্ধে হামাসের যোদ্ধারা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত। একারণে একাধিকবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী দিয়ে আগ্রাসন চালিয়েও ৩৬০ বর্গকিলোমিটারের গাজাকে হার মানাতে পারেনি ইসরাঈল।

২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত হামাসের ছোড়া রকেট হামলায় ১০ বছরে মারা গিয়েছে মোট ১৫ ইসরাঈলি নাগরিক।এই 'নির্বিচার' রকেট হামলার ঘটনাকে 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিভিন্ন 'মানবাধিকার' সংস্থা।মুদ্রার অপরপিঠ সবারই জানা।শুধু তিন ইসরাঈলি কিশোরকে হত্যার 'সন্দেহে' চলা অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজের মারণযজ্ঞে নিহত হয়েছে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি,যার মধ্যে রয়েছে চার দিন বয়সী শিশুও।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সীমাহীন আত্মত্যাগ, সততা-দক্ষতা ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও আমরণ লড়াইয়ের অদম্য মানসিকতাই হামাসকে দাঁড় করিয়েছে এক অনন্য অবস্থানে।শুধু ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ে নয় পৃথিবীর সব মজলুম ও সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে তাঁদের জন্য আছে অনন্য স্থান।সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৫২% ফিলিস্তিনি তাদের সমর্থন জানিয়েছে হামাসের পক্ষে,অপরদিকে ফাতাহ'র জনসমর্থন মাত্র ১৩%।Pew Research Center-এর একটি সমীক্ষা বলছে,জর্দানের ৬০% এবং লেবানন ও মিসরের ৫০% মানুষ হামাসের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা

ইসরাঈল নামক দেশটির জন্ম হয় জাতিসংঘের গৃহীত একটি প্রস্তাবের পরিণতিতে।ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনের মোট ভূখণ্ডের ৫৬% ভাগ এলাকা ইসরাঈলকে দেওয়া হয় এবং জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিকীকরণ করে বাকি অংশ ফিলিস্তিনী আরবদের জন্য রাখা হয়।ঐ সময় ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮% ভাগ ছিল ইহূদী। অতএব,সংখ্যালঘু ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ প্রদান সম্বলিত জাতিসংঘের ঐ সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনী মুসলিম তথা আরব জনগণ মেনে নেয়নি বিধায় ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।মার্কিন ও ব্রিটিশ অস্ত্রে সুসজ্জিত ইসরাঈলী বাহিনী এই যুদ্ধে জয়লাভ করে জাতিসংঘ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গার চেয়ে আরও অনেক বেশি আরব ভূখণ্ড দখল কর নেয়।লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনী মুসলিম নর-নারী এই যুদ্ধে গৃহহারা হয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট ফক বার্নাডোটকে জায়নবাদীরা হত্যা করে (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)।

তারপর হতে গত ৪৭ বছর 'প্যালেস্টাইন সমস্যা' ছিল জাতিসংঘের নিয়মিত আলোচনার বিষয়।বিশ্ব সংস্থায় এতবেশি আলোচনা আর প্রস্তাব গ্রহণ অন্য কোন সমস্যা নিয়ে হয়নি।একটি হিসাবে দেখা গেছে যে,১৯৪৮ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বছরে সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন সমস্যা নিয়ে দুই শতাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আর তার সঙ্গে যোগ করা যায় নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, মানবাধিকার কমিশন, জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিশন প্রভৃতিতে গৃহীত আরও শতাধিক প্রস্তাব।

১৯৪৮ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনে গৃহীত ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়ঃ "জাতিসংঘ
প্রস্তাব করছে যে, যে সমস্ত ফিলিস্তিনী বাস্তুহারা স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে যেতে চায়,তাদেরকে সেই সুযোগ দিতে হবে।"

১৯৪৯ সনের মে মাসে জাতিসংঘ ইসরাঈলকে সদস্যপদ দান করার সময় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে,ইসরাঈল তার সীমারেখার ব্যাপারে জাতিসংঘের ১৯৪৭ সনের নভেম্বরের প্রস্তাব এবং উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বরের প্রস্তাব কার্যকরী করবে।কিন্তু এই দু'টি প্রস্তাবের একটিও ইসরাঈল বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পায়নি।ইসরাঈলের এই অনমনীয় মনোভাব ফিলিস্তিনী সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে এবং ফলশ্রুতিতে অভূতপূর্ব মানবিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

আরব জাতীয়তাবাদ ও ইহুদীবাদের সংঘাতে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যেই প্রায় ৯ লক্ষ প্যালেস্টাইনী মুসলিম উদ্বাস্তু প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।গৃহহারা এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুরা অবর্ণনীয় দুঃখ- দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে থাকে।তাদের এই দুরবস্থা কিছুটা লাঘব করার জন্য 'জাতিসংঘ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসংস্থা' গঠিত হয়।এই সংস্থার পক্ষ হতে উদ্বাস্তুদেরকে তাঁবু এবং রেশন সরবরাহ করা হয়।এই ভাগ্যাহত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন অথবা ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে ১৯৫০ সন হতে ১৯৬৭ সনের মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৮ বার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও বৃহৎ শক্তিবর্গের হঠকারী রাজনীতির ফলে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫১ সালে নিরাপত্তা পরিষদ তার ৮৯ নম্বর প্রস্তাবে সর্বপ্রথম ইসরাঈলের নিন্দা করে।এরপর ১৮ই মে গৃহীত আরেক প্রস্তাবে বলা হয়,"অসামরিককৃত এলাকা থেকে ইসরাঈল যে সমস্ত ফিলিস্তিনীকে বিতাড়িত করেছে তাদেরকে তাদের বাড়ি- ঘরে ফিরে যেতে দিতে হবে এবং যুদ্ধ বিরতি কমিশন তাদের প্রত্যাগমন ও পুনর্বাসনের কাজ তদারক করবে।কিন্তু জাতিসংঘের অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এগুলিও অরণ্যেরোদনে পর্যবসিত হয়। ইসরাঈল কোন কিছুই গ্রাহ্য করেনি।কারণ তার পেছনে খুঁটির বল রয়েছে।

১৯৫৫ সনের ৩রা ডিসেম্বর জাতিসংঘের গৃহীত ১১৬ নম্বর প্রস্তাবে জাতিসংঘের সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটিতে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে,"উদ্বাস্তুদের স্ব-গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘের ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবের ১১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট দেশ কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছে।তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি অবশ্যই দিতে হবে।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহীত জাতিসংঘের ১০১৮ নম্বর প্রস্তাবেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়।কিন্তু ইসরাঈল বিশ্ব সংস্থার আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেনি এবং সে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদেরকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাদের আরও বিতাড়ন এবং তাদের বাস্তুভিটায় ইহুদীদের পুনর্বাসনের নীতি গ্রহণ করে।

ফিলিস্তিনীরা যে একটি জীবন্ত জাতি এবং তাদের এই জাতিসত্তার স্বীকৃতি যে বিশ্বের সব মহলেই রয়েছে,জাতিসংঘে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সনের ১০ই নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত ২৫২৫-বি নম্বর প্রস্তাবটি এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এ প্রস্তাবে সর্বপ্রথম স্বীকার করা হয় যে, ফিলিস্তিনীরা একটি পূর্ণ অস্তিত্বশীল জাতি। প্রস্তাবে বলা হয়-সাধারণ পরিষদ পুনরায় জোরের সঙ্গে ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার সমর্থন করেছে।উক্ত প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করে পরবর্তীকালে ১৯৭০ সনের ১০ই ডিসেম্বর

গৃহীত ২৬৭২-জি নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়-"জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সকল জাতির প্রতি সমান অধিকারের নীতিতে ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি সাধারণ পরিষদ স্বীকৃতি আপন করছে।

১৯৭৩ সনের ৭ই ডিসেম্বর গৃহীত জাতিসংঘের ৩০৮৯ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়-

১. পুনরায় জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে যে,জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক ফিলিস্তিনী জনগণেরও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে।

২. জাতিসংঘ পুনরায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে,ইসরাঈল ফিলিস্তিনী জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

৩. জাতিসংঘ ঘোষণা করছে যে, ফিলিস্তিনী জনগণের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছে তা বাস্তবায়ন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৪. জাতিসংঘ আরও ঘোষণা করছে যে, ফিলিস্তিনী বাস্তুহারাদের তাদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার ও নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার রয়েছে।

জাতিসংঘের উপরোক্ত স্বীকৃতি থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে,মার্কিন অস্ত্রের বলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের পৈত্রিক বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করলেও তারা এখনও একটি অস্তিত্বশীল জীবন্ত জাতি।

তাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশেনে ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিনিধি পি.এল.ও-কে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়।১৯৭৪ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'ফিলিস্তিন অধিবেশন' নামে অভিহিত ঐ অধিবেশনে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব ইয়াসির আরাফাত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে সমান মর্যাদায় জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করেন।১৯৭৪ সনের ২২শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে গৃহীত ৩২৩৬ নম্বর প্রস্তাব ফিলিস্তিনী জনগণের ও আতের প্রতিনিধি পি.এল.ও.-এর জন্য এক বিরাট সাফল্য। এই প্রস্তাবে বলা হয়,সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিন সমস্যা বিবেচনা করে।ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিনিধি ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার বক্তব্য ও অন্যদের বক্তব্য শোনার পর এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছে যে, ফিলিস্তিন সমস্যার কোন প্রকার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হয়নি এবং এটা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে অবস্থান করছে।তদুপরি,অধিবেশন এ স্বীকৃতি জানাচ্ছে

যে,জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছে।এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে,ফিলিস্তিনী জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।”

জাতিসংঘ সনদ ও এর মৌলিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এর পূর্ববর্তী গৃহীত প্রস্তাবসমূহের পুনরুল্লেখ করে সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে,

১. ফিলিস্তিনী জনগণের (বাইরের কোন হস্তক্ষেপ বা প্রভাব ছাড়াই) স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

২. বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনীদের-যেখান থেকে তারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের সেই নিজ নিজ বাড়ি-ঘর ও সম্পত্তিতে ফিরে যাওয়ার অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছে।

৩. ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের জন্য ফিলিস্তিনী জনগণের মতামত গ্রহণ অপরিহার্য।

৪. মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রচেষ্টায় ফিলিস্তিনীরা একটি সংশ্লিষ্ট পক্ষ।

৫. জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক ফিলিস্তিনী জনগণের তাদের ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে।

৬. জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উচিত জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ফিলিস্তিনীদের এই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ও সমর্থন দান করা।

৭. ফিলিস্তিনী জনগণের মতামত যাচাই এর জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের বেলায় পি.এল.ও. এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

৮. সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কার্যকরীকরণে অগ্রগতি সম্পর্কে ৩০তম অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১. ৩০ তম অধিবেশনকে 'ফিলিস্তিন প্রশ্ন' নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব,দেখা যায় যে,এই প্রস্তাবে ফিলিস্তিন সম্পর্কে জাতিসংঘে

গৃহীত পূর্ববর্তী সকল প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।অবশ্য এ সমস্ত প্রস্তাব ইসরাঈল প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে পাঁচটি বড় ধরনের যুদ্ধ ও হাজার হাজার ক্ষুদ্র সংঘর্ষ ঘটেছে।

জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনের বিশেষ তাৎপর্য হলো এই যে, এই অধিবেশনে ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার এবং ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থাকে ফিলিস্তিনী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দান করা হয়।তাছাড়া এই অধিবেশনে পি.এল.ও. কে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক সদস্য রূপে আসন গ্রহণের অনুমতি দান করা হয়।জাতিসংঘের ৩২৩৭ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয় যে, "ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থাকে জাতিসংঘের অধিবেশনে এবং এর সকল প্রকার আন্তর্জাতিক তৎপরতায় পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদানের আহ্বান জানানো হচ্ছে। "

১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন এবং ১৯৬৭ সনে অধিকৃত সকল আরব এলাকা হতে ইসরাঈলের নিঃশর্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।পরিষদের এই আহ্বান ১১৩ ভোটে গৃহীত হয়। ইসরাঈল, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও কোস্টারিকা বিপক্ষে ভোট দেয়।২৩টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমেই যে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়,এবং ১৯৪৯ সনে জাতিসংঘ সনদ মেনে নিয়েই যে ইসরাঈল উহার সদস্যপদ লাভ করে,সেই ইসরাঈল আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবই কার্যকরী করেনি।১৯৬৭ সনের ১৯ শে জুন ইসরাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবাইবান চরম ঔদ্ধত্যতার সাথে ঘোষণা করেন যে, "সাধারণ পরিষদের ১২১-১ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক হলে ইসরাঈল তা মানবে না।”

ইসরাঈলীগণ কর্তৃক জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট ফক বার্নাডোটকে হত্যা (১৯৪৮ খৃঃ) এবং ইসরাঈলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবাইবান কর্তৃক এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণার পরও জাতিসংঘ হাল ছাড়েনি।১৯৬৭ সনের যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ডঃ জারিংকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করে একটি 'বিশেষ কমিটি'।১৯৭৫ সনে গঠন করে আর একটি কমিশন "The Committee on the Exercise of the Inalinable Rights of the Palestinian People.”

পরিশেষে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইনীদের স্বপক্ষে,কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভেটো ক্ষমতার জন্য প্যালেস্টাইনীদের এই মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে।

১৯৮২ সনে ইসরাঈল কর্তৃক লেবানন আগ্রাসন এবং ফিলিস্তিনী গণহত্যার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের নিন্দা প্রস্তাবেও যুক্তরাষ্ট্র উপর্যুপরি দু'বার করে ভেটো প্রয়োগ করেছে।এছাড়া ১৯৮৩ সনের আগস্ট মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে অধিকৃত আরব অঞ্চলে ইসরাঈলী বসতি স্থাপন অবৈধ ঘোষণা এবং সেখানকার বেসামরিক আরব জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত শসস্ত্র হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব নেয়া হলে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মাঝে চৌদ্দ জন সদস্যই যখন ঐ খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়,তখন যুক্তরাষ্ট্র তাতে 'ভেটো' প্রয়োগ করে।এইভাবে, ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বপক্ষে জাতিসংঘ আজ পর্যন্ত যত প্রস্তাব পাশ করেছে,ইসরাঈল সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে উথাপিত প্রায় সব প্রস্তাবেই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করেছে।এইভাবে ইসরাঈলী অবাধ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভেটো ক্ষমতা অপব্যবহারের ফলে জাতিসংঘ ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে আজও সক্ষম হয়নি।

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ:
ফিলিস্তিনে যেহেতু মুসলমানদের প্রথম কিবলা অবস্থিত সেহেতু এর প্রতি তাদের ভালোবাসা অগাধ।মসজিদুল আকসাকে তারা 'দুই কিবলার মসজিদ' বলেও সম্বোধন করে থাকে।

তারা যখন ইসরার দিবস পালন করে তখনো এই মসজিদের প্রসঙ্গ চলে আসে তাদের অন্তর জুড়ে।আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

سُبْحٰنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بُرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
ايْتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: "পবিত্র ও মহিমান্বিত(সেই আল্লাহ তা' 'আলা) যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন,যার পারিপার্শ্বিতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম,যেন আমি তাকে আমার (দৃশ্য-অদৃশ্য) কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। (মূলত) সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা তো তিনিই।"

(সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত ১)

এটা এমন এক মু' জিযা যা দিয়ে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করা হয়েছে।এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই মুসলিম শাসকরা শুরু থেকেই এর ইসলামীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে যান।

ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ফিলিস্তিন বিজয় করেন ১৫ হিজরীতে।এ শহরে প্রবেশ করেই তিনি ওমরীচুক্তির মাধ্যমে এই শহরের বাসিন্দাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন।

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এক.ইসরা ও মিরাজের ভূমি:

ইসলামের অন্যতম বড় মু' জিযা মিরাজ। বিপদে জর্জরিত ও চাচা আবু তালিব ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার ইন্তেকালে শোকাভিভূত প্রিয়নবীর অশান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলানোর নিমিত্তে এক অসাধ্য সাধন কাজের মাধ্যমে নবুয়তের সত্যতাকে সুনির্ধারিত করতে আল্লাহ তা ' আলা প্রিয়নবীকে একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে নেন।সৃষ্টিজগতের সেরা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ এ ঘটনাটিই হলো মিরাজ।আর মসজিদে আকসার দেশ ফিলিস্তিনের বুকেই রচিত হয় সায়্যিদুল আম্বিয়ার সে শ্রেষ্ঠতম নৈশভ্রমনের ইতিবৃত্ত।সেসময় সৃষ্টির সেরা দুলালের পদস্পর্শে ধন্য হয় পৃথিবীর বরকতময় ও স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন।সে রাতে নবীজি মসজিতে আকসা থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করেন। এরপর বায়তুল মাকদিস হতেই তিনি উর্ধ্বাকাশে গমন করেন।

এ সম্পর্কে আনাস ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “বোরাক নিয়ে আসা হলো।বোরাক এমন জন্তু বিশেষ,যা ধবধবে সাদা ও দীর্ঘকায় বিশিষ্ট।গাঁধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে গঠনে ছোট।আর জন্তুটি এককে কদম রাখে দৃষ্টির শেষ সীমানায়।” তিনি বললেন,”আমি তার উপর আরোহন করে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত গমন করলাম। নবীগণ তাদের বাহনগুলো যেখানে বাঁধতেন আমিও সেটাকে সেখানে বাঁধলাম। ” তিনি বলেন,”অতঃপর আমি মসজিদে আকসাতে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম।তারপর আমি মসজিদ থেকে বের হলে জিব্রাইল আমার সামনে দু'টি পাত্র নিয়ে হাজির হলো।একটিতে ছিল মদ আরেকটিতে ছিল দুধ।আমি দুধের বাটিটাই বেছে নিলাম।” তখন জিব্রাইল বলল, “আপনি প্রকৃতিকেই বেছে নিয়েছেন।” পরিশেষে সেখান হতে আমাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়।”

(সহিহ মুসলিম)

দুই. মুসলমানদের প্রথম কিবলা:

ইসলামের কিবলা ও কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস একটি বহুল আলোচিত ও পর্যালোচিত বিষয়।ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহচরদের নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন।বায়তুল মাকদিস হলো আমাদের প্রথম কিবলা।মুসলমানদের প্রথম ভালবাসা।প্রথম ভালবাসা ভুলবার নয়। প্রথমটা পুরনো হলেও মুসলমানরা তার সুখস্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে এখনও।পরবর্তী সময়ে নবীজির হৃদয়ের চাহিদা ও মনোবাসনাকে পূর্ণতাসহ বিভিন্ন প্রজ্ঞার কারণে প্রজ্ঞাবান মহান সৃষ্টিতর্কার নির্দেশে

কিবলা পরিবর্তিত হলেও এখনও তার ভালবাসা ইসলামের প্রথম সালাতের আদায়ের দিনের মতো প্রোজ্জ্বল।

হিজরি দ্বিতীয় সনের শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামসহ মদিনার অদূরে মসজিদে বনু সালামায় যোহর মতান্তরে আসরের নামাজ আদায় করেন।দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাতের মাঝামাঝি সময়ে মহান আল্লাহ তা ' আলার নির্দেশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম চার রাকাতের অবশিষ্ট দুই রাকাআত কাবার দিকে ফিরে আদায় করেছিলেন বলে মসজিদটি 'মসজিদে কিবলাতাইন' বা 'দুই কিবলার মসজিদ' হিসেবে সমধিক পরিচিত।এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন সময়ে পবিত্র কাবা তার সামনে থাকাবস্থায় বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। মদিনায় হিজরতের পর সুদীর্ঘ ষোল মাস সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করেন। অতঃপর কাবার দিকে মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তিত হয়।"

(মুসনাদে আহমদ, হাদিস:২৮৩৬)

তিন.পৃথিবীর বুকে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ:

মসজিদ হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। ঈমানের ইস্পাতকঠিন দূর্গ।তাওহীদের বাণীর প্রচার-প্রসার ও কুরআন-হাদিস চর্চার আঁতুড়ঘর।সেকালের জ্ঞানচর্চার প্রধান শিক্ষালয়।ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদ মজসিদুল হারাম হলেও এরপরের স্থানে আছে সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ মসজিদে আকসা।এটা নি:সন্দেহে ফিলিস্তিনবাসী মুসলমানদের জন্যে বিশেষ সম্মানের বিষয়;অন্যান্য মুসলমানদের অশেষ গৌরবের বস্তু।আবু যর গিফারির মুখ থেকেই শুনে নিই সে গৌরবময় উপাখ্যান–

আবু জর গিফারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে?"তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন,তারপর হলো মসজিদুল আকসা। অতঃপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের?তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান।

(সহিহ বুখারি, হাদিস:৩১১৫)

চার.বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের বিশেষ ফজিলত :

কাজের স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কাজের মর্যাদা ও মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।তেমনি সালাত আদায় করা ও প্রহরার ক্ষেত্রেও স্থান অনুপাতে এ মর্যাদা শতগুন বেড়ে যায়।মসজিদুল আকসায় সালাত আদায় ও প্রহরায় সওয়াবের বিষয়ে জানা যায়:

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন,"যখন সুলায়মান ইবনু দাউদ বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন,তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করলেন।তার মতো শাসনক্ষমতা এবং এমন রাজত্ব,যা তার পরে কাউকে প্রদান করা হবে না ও সালাত আদায়ের একনিষ্ঠ মনে উক্ত মসজিদে আগমনকারীর পাপ মোচন করে তার জন্মের দিনের মতো নিষ্পাপ করার প্রার্থনা করেছেন।"
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"আল্লাহ তার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে দুটি প্রদান করেছেন।তৃতীয়টিও কবুল করবেন বলে প্রত্যাশা করছি।"

(সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস:১৪৭৯)

পাঁচ.মাসজিদুল আকসায় সফরের প্রতি নবীজির বিশেষ গুরুত্বারোপ:

ফিলিস্তিন প্রাকৃতিক নদ-নদী,ফল-ফসলের প্রাচুর্যতা এবং নবি-রাসূলের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।আর এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তার দিকে সফরের বিশেষ গুরুত্বের কথা। মহানবী (সা.) মসজিদুল হারাম,মসজিদে নববি ও মসজিদুল আকসার উদ্দেশ্যে সফরকে বিশেষ পুণ্যময় কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।এ বার্তা অন্যকোনো মসজিদের ব্যাপারে আসেনি।

অধিক সংখ্যক সাহাবা এবং ওলামাগণ এখানে বসতি গড়ে তোলেন।এখানে এসে মসজিদুল আকসায় তারা নামাযও আদায় করেন,কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,
"তোমরা অবশ্যই শামকে গুরুত্ব দিবে। এটা আল্লাহর নির্বাচিত অঞ্চল।এখানে যারা থাকে তারা সৃষ্টির সেরা।যার পক্ষে সম্ভব নয় সে যেন তার আশেপাশে হলেও যায় এবং তার প্রবাহগুলো থেকে পানি পান করে।আল্লাহ আমাকে শাম আর তার অদিবাসীদের ব্যাপারে বলে রেখেছেন।"

(আলবানী-সহীহুল জামে আল সগীর)।

ওমর রাদিআল্লাহু আনহু যখন শাম বিজয় করেন তখন থেকেই মুসলমানরা সেখানে সালাত আদায় করতে যেতেন।সেই সাথে দাওয়াত ও জিহাদের কাজও করতেন। স্বয়ং ওমর রাদিআল্লাহু আনহু অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীনদের সেখানে থেকে যেতে বলেন যাতে করে তারা সেখানে প্রশাসনকার্যের পাশাপাশি দাওয়াত ও তালীমের কাজও করতে পারেন।এ জন্য তিনি মসজিদুল আকসায় তাদের কেন্দ্র বানাতে বলে যান।এরই জেরে ওবাদাহ ইবনুস-সামিত ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম কাজি।তার সাথে ছিলেন সাদ্দাদ ইবনে আউস।তাদের দু'নজনের ইন্তেকাল হয় ফিলিস্তিনে এবং দাফনও সেখানেই হয়। আজও মসজিদুল আকসার পূর্ব প্রাচীরের পাশে এই দুই জলিলুল কদর সাহাবীর কবর দেখতে পাওয়া যায়।তারা যে মাকবারায় দাফন হন,তার নাম হচ্ছে 'বাবুর-রাহমাহ' ।

উল্লেখযোগ্য সাহাবীদের মধ্যে যারা মসজিদুল আকসায় যিয়ারাতে যান তারা হচ্ছেন ওমর ইবনুল খাত্তাব,আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি সফিয়া বিনতে হাই, মুয়ায ইবনে জাবাল,আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ,আবু যর আল-গিফারি,আবু দারদা,সালমান আল-ফারসি,আমর ইবনুল আস,সাইদ ইবনে যাইদ যিনি ছিলেন জান্নাতের সুখবর পাওয়া দশজনের একজন,আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এবং আরো অনেকে।

সাহাবীদের পরও বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামও বাইতুল মাকদিসে এসে বসতি স্থাপন করেন।সেখানে তারা বিভিন্ন ইলম চর্চা করে ইসলামী সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।যেমন,বিখ্যাত মুফাসসির মুকাতিল ইবনে সুলাইমান,শামের ফকীহ ইমাম আল-আওযায়ী,ইরাকের ইমাম সুফিয়ান সাওরী,মিশরের বিখ্যাত আলেম লাইস ইবনে সা'দ এবং চার ইমামের এক ইমাম ইমাম শাফেয়ী (রহ.)।

ছয়.বরকতময় ভূখণ্ড:

পবিত্র কোরআনের ৫ স্থানে মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনকে বরকতময়,পুণ্যময় ভূখণ্ড বলেছেন।

১. সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَا مِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَ قْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা বনি ইসরাইল:আয়াত ১)

২.সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার সময় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَ رْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি তাকে ও (তার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন দেশে (অর্থাৎ ফিলিস্তিনে) নিয়ে গেলাম যা আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় করেছি।"

(সূরা আল-আম্বিয়া:আয়াত ৭১)

৩. মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনায়, যখন ফেরাউনের কবল থেকে মূসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করে আনা হয় এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَ وْرَثْنَا الْـقَوْمَ الَّذِيْنَ كَا نُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَا رِقَ الْاَ رْضِ وَمَغَا رِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَا نَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَا نُوْا يَعْرِشُوْنَ

"আর আমি দুর্বল করে রাখা লোকেদেরকে সেই যমীনের পূর্বের আর পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম যাতে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছি।এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্যধারণের কারণে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হল আর ফির 'আওন ও তার লোকজনের গৌরবময় কাজ ও সুন্দর প্রাসাদগুলোকে ধ্বংস করে দিলাম।"

(সূরা আল-আরাফ:আয়াত ১৩৭)

৪. সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘটনায়। মহান আল্লাহ তাকে রাজ্য দান করেছিলেন এবং সবকিছুকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَا صِفَةً تَجْرِيْ بِاَ مْرِهٖۤ اِلَى الْاَ رْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ

"(আমার ক্ষমতা বলেই) আমি উদ্দাম বায়ুকে (স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন) করেছিলাম সুলায়মানের জন্য।তার নির্দেশ মত তা প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে যাতে আমি কল্যাণ রেখেছি।আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম।"
(সূরা আল-আম্বিয়া:আয়াত ৮১)

৫. সাবা-এর ঘটনায় আল্লাহ তাদের কীভাবে সুখ-শান্তিতে রেখেছিলেন।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۗ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَا لِيَ وَاَ يَّا مًا اٰمِنِيْنَ

"তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং ওগুলোর মাঝে সমান সমান দূরত্বে সফর মনযিল করে দিয়েছিলাম।(আর তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা এ সব জনপদে রাতে আর দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।"
(সূরা সাবা:আয়াত ১৮)

আল্লামা মাহমুদ আলুসী তাফসিরে রুহুল মাআনিতে উল্লেখ করেছেন,এই জনপদ বলতে শামকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এ জনপদ হলো- বায়তুল মুকাদ্দাস।প্রাচীন শামদেশ (Levant) হলো-বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন।

সাত.তৃতীয় সম্মানিত শহর ও ফজিলতপূর্ণ ভূমি:

হাদিসের আলোকে প্রমাণিত যে তিনটি শহর সম্মানিত-মক্কা,মদিনা ও ফিলিস্তিন বা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,”(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না।মসজিদুল হারাম,আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।’

(সহীহ মুসলিম:হাদিস ৮২৭)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,”যখন সুলায়মান ইবনু দাউদ বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন,তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করলেন-তার মতো শাসনক্ষমতা এবং এমন রাজত্ব,যা তার পরে কাউকে প্রদান করা হবে না ও সালাত আদায়ের একনিষ্ঠ মনে উক্ত মসজিদে আগমনকারীর পাপ মোছন করে তার জন্মের দিনের মতো নিষ্পাপ করার প্রার্থনা করেছেন।’

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,”আল্লাহ তার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে দুটি প্রদান করেছেন।তৃতীয়টিও কবুল করবেন বলে প্রত্যাশা করছি।’ (সুনানে ইবনু মাজাহ:হাদিস ১৪৭৯)

আট.সত্যবাদী দলের অবস্থান:

আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,”আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে।দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না।আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন,হে আল্লাহর রাসূল,তারা কোথায় থাকবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,”তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশপাশে থাকবেন।”

(মুসনাদে আহমদ:২১২৮৬)

নয়. ফিলিস্তিন হাশরের ময়দান:

বাইতুল মাকদিস হচ্ছে রোজ-হাশরের ময়দান।কিয়ামতের দিন এখানেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সমবেত করেন।এখানেই আল্লাহ তায়ালা হাশরের মাঠ নির্ধারণ করে রেখেছেন।মায়মুনা রাযিআল্লাহু তা’ আলা আনহা বলেন,

“আমি বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ বাইতুল মাকদিসের ব্যাপারে কিছু বলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান।পুনরুত্থানের জায়গা।তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো।কেননা,তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়।"

তিনি বললেন,"যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসাতে গমনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?"তিনি বললেন,"সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে।কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে,সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়ার লাভ করবে।'

(মুসনাদে আহমদ, হাদিস, ২৬৩৪৩)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় মক্কায় মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি দেখা দেয় আর এখান থেকেই সবাই আখেরাতে ফিরে যাবে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় মক্কায়, এখানেই শুরু হয় ইসলামের দাওয়াত।আর দীনের ঐতিহাসিক পরিপূর্ণতা আসবে বাইতুল মাকদিসের মাধ্যমে।এখানেই শেষ জামানায় ইমাম মাহদি আবির্ভূত হবেন। আর এটাকে রক্ষার জন্য মুসলমানরা যে রক্ত এ পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছে সেটাই হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তেল উদ্দেশ্য।ক্রুসেডারদের দখল থেকে বাইতুল মাকদিসকে উদ্ধার করার জন্য মুসলমানরা অকাতরে নিজেদের রক্ত দিয়ে গেছে।আর এখনো ইহুদী দখলদারি ঠেকাতে ফিলিস্তিনিরা তা করে যাচ্ছে। তাদেরকে কূটনৈতিক,অর্থনৈতিক আরো বিভিন্নভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে দূর প্রান্তের মুসলমানরা।

দশ.ফিলিস্তিনের তীর্থযাত্রীদের বিশেষ ফজিলত:

ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হজ্ব মুমিনদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল।এ বিশেষ আমলটির রয়েছে সবিশেষ মর্যাদা।তবে বিশেষ অবস্থার কারণে ফিলিস্তিনের হজ্বযাত্রীদের জন্যে নবিজি বিশেষ অফার ঘোষণা করেছেন। হজ্বের নির্ধারিত সওয়াব তো থাকছেই, সাথে আছে আরো বিশেষ অফার।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,আমি রাসুল (সা.)কে বলতে শুনেছি যে,"যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদে হারামে হজ্ব কিংবা উমরা পালনে গমন করবে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিংবা তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস:১৪৭৯)।

এগারো.বীর-মহাবীর এর দেশ ফিলিস্তিন:

ফিলিস্তিনি জাতি মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়া নিবেদিত লড়াকু হাজারো বীরের দেশ। ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ও বাইবার্সের দেশ ফিলিস্তিন।এ পবিত্র ভূমিতে কেয়ামত অবধি মায়েদের কোল আলোকিত করে জন্ম নেবে হাজারো রথী-মহারথী ও বীরপুরুষ।মুজাহিদরা কেয়ামত পর্যন্ত নিবেদিত থাকবেন ফিলিস্তেনর মাটিতে।এ প্রসঙ্গে উমামা (রা.)-এর মুখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যটা শুনে আসা যাক:

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন-"আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে,দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না;আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন,হে আল্লাহর রাসুল!তারা কোথায়?রাসুল (সা.) বললেন,"তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশেপাশে।"
(মুসনাদে আহমদ,হাদিস ২১২৮৬) দ

বারো.শেষকালের হিজরতভূমি:

নববী জীবনের ত্রয়োদশতম বছরে সংঘটিত হলো মক্কা থেকে মদিনার হিজরত।এরপর পৃথিবীতে সংঘটিত হবে মহা হিজরত।আর সে হিজরত হবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হিজরতভূমির দিকে।এ মহা হিজরতের আলোচনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.)।তিনি কি বলছেন তা জানা যায়এ বর্ণনায়:

আল-আকসা মসজিদের আঙিনা।
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে,অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে।তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে,যারা ওই জায়গায় হিজরত করবে,যে জায়গায় হযরত ইবরাহীমম (আ.) হিজরত করেছিলেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে-এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হিজরতের স্থানকে নিজেদের হিজরতস্থল বানাবে।এ সময় কেবল মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে।তাদের দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে।আল্লাহ তা' আলা তাদের ঘৃণা করবেন।অতঃপর একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শুকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।তারা

যেখানে রাতযাপন করবে, আগুনও সেখানে রাত কাটাবে।আর যেখানে তারা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করবে,আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে।
(সুনানে আবু দাউদ:হাদিস ২১২৩) ।

তেরো.মালহামাতুল কুবরা বা মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্র:

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,এই ঘটনা না ঘটার আগে কেয়ামত হবে না। রোমকরা আ'মাক কিংবা যাবেক এলাকায় ঢুকে পড়বে।তখন মদীনা থেকে একটি বাহিনী বের হবে আর তারাই হবে পৃথিবীর সেরা।যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়াবে তখন রোমকরা বলবে,আমাদেরকে তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে দাও তোমাদের মধ্যে যারা আমাদেরকে গালমন্দ করেছে।তখন মুসলমানরা বলবে আল্লাহর কসম আমরা আমাদের ভাইদেরকে কখনো তোমাদের কাছে ঠেলে দিব না।তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের তিন ভাগের এক ভাগ মারা যাবে যাদের আল্লাহ কখনো মাফ করবে না।আর তিন ভাগের এক ভাগ শহীদ হয়ে যাবে।তারাই হবে আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়শহীদ।আর তিন ভাগের এক ভাগ বিজয় লাভ করবে।তারা আর কখনো বিপদের মুখোমুখি হবে না।এরপরই কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে।' ইমাম নববি বলেন আ'মাক আর দাবেক শাম এলাকার হালাবের (আলেপ্পা) কাছাকাছি একটি জায়গা।

উপসংহার:
ঈসরায়েলিদের দ্বারা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন ও নিপীড়নে চলছে অনবরত।মজলুম মুসলিমদের হাহাকারে প্রকম্পিত হচ্ছে ফিলিস্তিন ও আল-কুদসের আকাশ-বাতাস চারদিকে।ইসলামের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা ও মসজিদে আকসাকে সমূলে ধ্বংস করাই ইহুদিদের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথেই হাঁটছে দখলদার ইহুদীরা।এতকিছুর পরও ফিলিস্তিন শেষ হয়ে যায়নি।হামাসের নেতৃত্বে ইন্তিফাদা ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনবাসী দিয়ে যাচ্ছে জিহাদ ও শাহাদাতের অন্তহীন নাজরানা।যা আজ বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দেখছে।

সহায়ক পুস্তক

১.রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন-জসিমউদদীন

আহমাদ

২.ফিলিস্তিন একজন সালাহুদ্দীনের অপেক্ষায়-ড.নুর আলম খলিল আল-আমিনী

৩.ফিলিস্তিন সমস্যার ক্রমবিবর্তন-মোহাম্মদ রেজাউল করীম

৪.মাসিক আল কাউসার